শেষ কুত্তা

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

৫৭/২ ডি কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৭০
প্রকাশিকা : মাধবী মণ্ডল
সংবাদ প্রকাশন, ৫৭।২ ডি কলেজ ষ্ট্রীট,
কলকাতা-৭০০০৭৩
মুদ্রক : শিশিরকুমার সরকার
শ্যামা প্রেস, ২০বি, ভুবন সরকার লেন,
কলকাতা-৭০০ ০০৭

স্নেহের পাখিকে

শেষ কুত্তা

এমনিই আমাদের সংসার হাওয়া খেয়ে চলছে, তার ওপর দাদাকে নিয়ে এক মহা অশান্তি। মেজাজ করে রেখেছে একেবারে দুর্বাসা মুনির মত। পান থেকে চুন খসলেই হল। তেলে বেগুনের মত জ্বলে উঠবে, আর যত কোপ আমার ভালো মানুষ বউদির ওপর। খেটে খেটে বেচারার সোনার বর্ণ কালি হয়ে গেছে। দাদার ভয়ে একেবারে টুঁ শব্দটি করে না। সবই দেখি, করার কিছু নেই। বেকার বসে আছি আজ বছর তিনেক। যাও বা একটা চাকরি জুটেছিল, চলবে না চলবে না করে তাও চলে গেল। পাক্কা তিন বছর হয়ে গেল, ধর্মঘটের নেতারা প্রতিষ্ঠানের আষ্টেপৃষ্ঠে দরমায় দাবির ফিরিস্তি সেঁটে, বন্ধ গেটের সামনে পালা করে অষ্টপ্রহর তাস পিটে চলেছে, আর আমরা মাসে মাসে চাঁদা দিয়ে চলেছি। মালিকরা অন্য স্টেটে গিয়ে কারখানা খুলে বসেছে। হায় আন্দোলন!

একটু আগে দাদা অফিস থেকে ফিরেছে। আসার আগে একটা টিউশানি সেরেছে। ছেলে ঠেঙানো কি জিনিস, সে আমি

জানি। বকে বকে মুখে ফেনা উঠে যায়। শিক্ষকতা করতে গেলে খাঁটি গব্য ঘৃত খেতে হয়। এ বাজারে সে মাল জুটবে কোথায়!

বউদি বোধ হয় চা করে নিয়ে গিয়েছিল। চিনি কম, কি লিকার পাতলা, কি হয়েছিল কে জানে! মিনিট পাঁচেক হয়ে গেল খুব হম্বিতম্বি চলেছে। বউদি যথারীতি নীরব! এ কায়দাটা বউদি ভালো রপ্ত করেছে। দু'পক্ষই সরব হলে আগুন জ্বলে যেত।

হঠাৎ কাপ ডিশ পড়ার শব্দ হল। এ কি! দাদার আর যাই থাক ভাঙাচোরার স্বভাব তো ছিল না। ভয়ে ভয়ে ঘরের বাইরে থেকে উঁকি মারলুম। এ দেশে ইদানীং বউ মারার হিড়িক পড়েছে। বড় ছোয়াচে রোগ। বউদি দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে অসহায় মুখে দাঁড়িয়ে। দাদা চেয়ারে কাত। মেঝেতে কাপ আর ডিশ পড়ে ছত্রখান। ঢাল বেয়ে চা গড়িয়ে চলেছে। দাদা দু'হাতে বুকের মাঝখানটা চেপে ধরে আছে। সর্বনাশ! হার্ট অ্যাটাক না-কি? থ্রম্বোসিসের সঙ্গে চা আর বাথরুমের ভীষণ যোগ।

লাফিয়ে ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করলুম, কি হোলো দাদা?

কোনও রকমে ফিসফিস করে বললে, হয়ে গেছে। বড় যন্ত্রণা।

বউদি ছুটে এসে বুকে হাত বোলাতে বোলাতে বললে, ঠাকুরপো, ডাক্তার!

এই অবস্থায় মানুষের আর কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না। কোনও রকমে সাইকেলটা বের করে ছুটলুম, ডক্টর চঞ্চল মিত্রের চেম্বারের দিকে। আর কোনও নাম আমার মনে এল না। ডক্টর মিত্র বিলেত ফেরত হার্ট স্পেসালিস্ট। তিনি ছাড়া আর কে দাদাকে সামলাতে পারেন। চৌষট্টি টাকার ধাক্কা। তা হোক। জীবন বড়, না টাকা বড় ?

ডক্টর মিত্রের চেম্বারে লাইন পড়ে গেছে। নীল রঙের ঝকঝকে বিলিতি গাড়ি রাস্তার একপাশে বাপ-কা বেটার মত দাঁড়িয়ে আছে। দেখলেই ভয় আর ভক্তি দুটোতেই মনটা কেমন যেন হয়ে যায়। ভেতরের চেম্বারে রাগী রাগী চেহারার অসম্ভব ফর্সা এক মানুষ একজনের ব্লাডপ্রেসার পরীক্ষা করছিলেন। মুখ তুলে তাকালেন। চোখে প্রশ্ন।

ডাক্তারবাবু, দাদা হঠাৎ সেন্‌সলেস হয়ে গেছেন।

ফার্স্ট না সেকেণ্ড অ্যাটাক ?

আজ্ঞে ফার্স্ট।

ভেবেছিলুম বলবেন, আমার সময় নেই, হাতে পেসেন্ট রয়েছে। অন্য কাউকে ধরে নিয়ে যান। তা কিন্তু বললেন না। তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে বললেন, চলুন। যাঁর প্রেসার দেখছিলেন, তাঁর হাত থেকে প্রেসার মাপা যন্ত্র খুলে নিলেন। ভদ্রলোক রাগ রাগ গলায় বললেন, কী হল ?

ডাক্তারবাবু শান্ত গলায় বললেন, আপনি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেও মারা যাবেন না, এটা হল লাইফ অ্যাণ্ড ডেথের প্রশ্ন।

এমার্জেন্সি। বসে বসে ম্যাগাজিন পড়ুন, গান শুনুন। এই ভাস্কর!

ভাস্কর মনে হয় অ্যাসিসট্যাণ্ট। ভারি সৌম্য চেহারা। বললে, বলুন স্যার?

গান চালিয়ে দাও, সফ্‌ট মিউজিক। আমি আসছি।

ব্যাগ হাতে ডাক্তারবাবু আমার পাশে পাশে বাইরে বেরিয়ে এলেন। আমার মানসিক দুর্বলতা অনেকটা কেটে এসেছে। প্রকৃত যিনি বৈদ্য, তিনি তো শুধু ফী নিয়ে প্রেসক্রিপসান লেখেন না, তিনি রুগীর মনে, রুগীর আত্মীয়-স্বজনের মনে এক ধরনের ভয়শূন্যতা সৃষ্টি করেন। মনে হয় যেন ঈশ্বরের হাতে সব সমর্পণ করে দিতে পেরেছি। রাখে কেষ্ট মারে কে, মারে কেষ্ট রাখে কে?

ডাক্তারবাবু বললেন, ভয় পাবেন না, ফার্স্ট অ্যাটাক, মনে হয় সামলে দিতে পারব।

আমার চোখে জল এসে গেল। মনে হল, সব ডাক্তারই কি এমন, না ইনি হৃদয় নিয়ে আছেন বলেই এমন হৃদয়বান!

কি ভাবে জানি না, দাদা বিছানায় শুয়ে পড়েছেন। মাথার কাছে বউদি বসে, হাল ভাঙা নাবিকের মত, ঘটনা-স্রোত যেদিকে নিয়ে যায়। পায়ের কাছে শিশু ভাইপো। চোখে জল টলটল করছে। ডাক্তারবাবুকে দেখে বউদি ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল। ভাইপো কাঁদো কাঁদো গলায় বললে, আমার বাবা।

ডাক্তারবাবু স্টেথিসকোপ-ধরা হাত তুলে বললেন, কিছু ভয় নেই, সব ঠিক হয়ে যাবে। এই সামান্য কথায় রুগীর ঘরে অদ্ভুত একটা বিশ্বাস নেমে এল। শমন যেন থমকে দাঁড়াল। মৃত্যু নামক জোঁকের মুখে মুনের ছিটে পড়ল। দাদা হঠাৎ চলে গেলে সংসারের কি হবে রে বাবা! ভাবা যায় না! সব চেয়ে বিশ্রী অবস্থা হবে আমার। বউদি আর ভাইপোকে বয়ে বেড়াতে হবে সারা জীবন। যে মেয়েটিকে ভালবাসি তাকে আর বিয়ে করা যাবে না। ভীষ্মের বরাত নিয়ে সংসার সমরাঙ্গনে শরশয্যার ব্যবস্থা পাকা হয়ে যাবে।

রুগীকে পরীক্ষা করতে করতে ডাক্তারবাবু মুখ তুলে বললেন, না বাড়িতে হবে না, হাসপাতালেই নিয়ে যেতে হবে। বায়ুর উর্ধ্ব-চাপ নয়, হার্টের সাউণ্ড সুবিধের ঠেকছে না।

হাসপাতালের নাম শুনে বুক কেঁপে উঠল। বাবা কয়েক বছর আগেই ফ্রি-বেডে প্রায় বিনা চিকিৎসায় অসীম অবহেলায় কুকুর বেড়ালের মত মারা গেছেন। হয়তো বেঁচেই ফিরতেন, যদি না হাসপাতাল-কর্মীরা সেই সময় আন্দোলনে নামতেন। রুগীদের সেই সময় কি অবস্থা! নাকে নল আছে, সিলিণ্ডারে অকসিজেন নেই। সিলিণ্ডারে অকসিজেন আছে, তো নাক থেকে নল খুলে গেছে। দেখার কেউ নেই। বোতলে স্যালাইন নেই, হাতে ছুঁচ ঢুকে আছে। বেডপ্যানের যোগাড় নেই, কুম্ভক করে বসে আছেন। বিছানার তলায় রাস্তার কুকুর ঢুকে বসে আছে। আন্দোলনকারীরা ইট-পাটকেল

ছুঁড়ে, বোমা ফাটিয়ে এমন এক দক্ষযজ্ঞ করলেন, দু'চারটে হার্টের পেশেণ্ট হার্টলেস ওয়ার্লড থেকে, ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি, বলে পগার পারে চলে গেলেন। বাবাও তাঁদের মধ্যে একজন।

সেই হাসপাতালের নাম শুনে গলা শুকিয়ে গেল। বউদি মৃদু গলায় বললে, তা হলে তো অ্যাম্বুলেন্স চাই! সে তো আজ বললে কাল আসবে।

ডাক্তারবাবু বললেন, সে যুগ আর নেই। এখন রিসিভার তুললেই নিমেষে চলে আসে। আপনারা বোধহয় অনেক দিন পরীক্ষা করে দেখেননি! মানুষ আর কতকাল অমানুষ থাকবে! আমাদের দেশে সবই ছিল, মানুষ ছিল না। মানুষ আবার মানুষে ফিরে আসতে সুরু করেছে। রাস্তাঘাটের অবস্থা দেখে বুঝতে পারছেন না? দেশের চেহারা পালটাতে শুরু করেছে।

ডাক্তারবাবু একটা ইন্জেকসান দিলেন। বললেন, আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে অ্যামবুলেন্সের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। চেম্বারে রুগী না থাকলে আমার গাড়িতেই পেঁৗছে দিতুম।

বউদিকে ফিসফিস করে বললুম, ফীজটা দাও।

বউদি ফিস্‌ফিস্ করেই বললে, টাকা কোথায়, শেষ মাস না!

ডাক্তারবাবু শুনে ফেলেছেন। এক মুখ হেসে বললেন, কিছু ভাববেন না। ~ ফীজ দেনে-অলারা ঘর আলো করে বসে

আছেন। বুঝেছি হাত খালি। আপনারাই বরং কিছু টাকা রাখুন, পরে শোধ করে দেবেন।

বউদি আর আমি অবাক হয়ে দু'জনে দু'জনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম। এই কি সেই পৃথিবী! যাকে আমরা বলি হৃদয়হীন, নিষ্করুণ। যা কি-না টাকার বলবেয়ারিং-এ ঘুরছে! এখন আমার বলতে ইচ্ছে করছে, সত্য সেলুকাস কি··· !

বিশ্বাস থেকে যেমন অবিশ্বাস, অবিশ্বাস থেকে তেমনি বিশ্বাস। অ্যামবুলেন্স সত্যিই এসে গেল। হাসি হাসি মুখ দু'জন স্ট্রেচার-ধারী স্নেহের গলায় জিজ্ঞেস করলেন, কি কেস ? হার্ট ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তাহলে তো এ স্ট্রেচার চলবে না। বিমান, তুমি ওই স্পঞ্জ লাগানো, ইলেকট্রনিক লেভেল কন্ট্রোল লাগানো, শকপ্রুফ বিদেশী স্ট্রেচার নামাও। রুগীকে রেকর্ডপ্লেয়ারের মত সমান রাখতে হবে।

বাবা! সে আবার কি জিনিস! দেশটা রাতারাতি ইওরোপ, আমেরিকা হয়ে গেল না কি! চাকা লাগানো সুদৃশ্য একটি স্ট্রেচার নেমে এল। কোথাও কোনও দাগ নেই। বাগান থেকে তুলে আনা শিশির ভেজা ফুলকপির মত টাটকা। ওঁরা দাদাকে এমন সযত্নে বিছানা থেকে তুলে স্ট্রেচারে রাখলেন, যেন মা তার কোলের শিশুটিকে সাবধানে দোলায় শুইয়ে দিচ্ছে। ঈশ্বর দ্যাখো, মানুষের প্রতি মানুষের কি ভালবাসা! আমার দাদাকে আমিও বোধহয় এত ভালবাসি না। দাদা

এখন আচ্ছন্ন হয়ে আছে, তাই এত বড় একটা ব্যাপার টের পেল না। পেলে আর বলতে পারত না, রোজ যেমন বলে, ভালোয় ভালোয় এবার সরে পড়তে পারলেই বাঁচি।

ঝড়ের বেগে অ্যামবুলেন্স চলেছে। মাথার নীল আলো চক্রাকারে ঘুরছে। অ্যামবুলেন্স দেখে সমস্ত গাড়ি পথ ছেড়ে দিচ্ছে। সাংঘাতিক লরিও বাধ্য পশুর মত একপাশে সরে যাচ্ছে; ট্র্যাফিক পুলিস হাত নামিয়ে নিচ্ছে। ভাবা যায় না! একমাত্র মুখ্যমন্ত্রী, কি প্রধানমন্ত্রী, কি রাষ্ট্রপতির বরাতেই এমন খাতির জোটে। দেশটা কবে এমন হয়ে গেল! কালও কি এমন ছিল! গাড়ির ভেতরে গুনগুন করে পাখা চলছে। চারপাশ কাঁচ দিয়ে এমন ভাবে ঢাকা, বাইরের কোনও শব্দই কানে আসছে না। আমি, বউদি আর ভাইপো মান্তু একপাশে চুপ করে বসে আছি। সামনে স্ট্রেচারে দাদা। দাদার পায়ের কাছে বিমানবাবু।

হাসপাতালের গেট দিয়ে গাড়ি ঢুকছে। কী আশ্চর্য, কয়েক দিন আগেও গেটের মাথার আলোকিত লেখাটি ভেঙে ত্রিভঙ্গ হয়ে ছিল। আজ একেবারে কটকট করে জ্বলছে। ফুটপাথে কিছুদিন আগেও দেখেছিলুম আবর্জনা পড়ে আছে কাদা মাখামাখি হয়ে। আজ সব সাফসুফ। চারপাশে তকতক করছে। মনে পড়ল, বিদেশী একজন ক্রিকেট খেলোয়াড় আমাদের হাসপাতালকে বলেছিলেন, শূকরের খোঁয়াড়। সেই ভদ্রলোককে আজ একবার ডেকে নিয়ে এলে হয়।

অ্যামবুলেন্স এমার্জেনসির সামনে এসে দাঁড়াল। খুট্ শব্দে আমাদের দরজা খুলে গেল। সাদা পোশাক পরা দু'জন কর্মী সামনে দাঁড়িয়ে। গলায় স্টেথিস্কোপ ঝুলছে মালার মত। তাঁরা খুব বিনীতভাবে বললেন, ডক্টর মিত্র? হার্ট?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আপনারা চলে আসুন।

আমরা নেমে দাঁড়ালুম। সত্যি বলছি, এই অপ্রত্যাশিত ব্যবহারের জন্যে আমরা প্রস্তুত ছিলুম না। এতকাল যা শুনে এসেছি, যা দেখে এসেছি সব মিথ্যে। শুনেছি, এমার্জেনসিতে কেলোর কীর্তি হয়। কোনও অ্যাটেনডিং ফিজিসিয়ান থাকেন না। আর. এম. ও-কে কোয়ার্টার থেকে গান পয়েন্টে টেনে আনতে হয়। মরণাপন্ন রুগী মেঝেতে শুয়ে কাতরাতে থাকে। কি ভাবে আমাদের ব্রেন-ওয়াশ করে দিয়েছে প্রতিষ্ঠান-বিরোধী অপ-প্রচারকের দল!

ডক্টর মিত্রের সত্যিই কোনও তুলনা হয় না। শুধু অ্যামবুলেনস নয়, হাসপাতালেও খবর দিয়ে রেখেছেন। জুনিয়র ডাক্তার দু'জন বললেন, এঁকে আমরা কার্ডিয়াক ইউনিটে নিয়ে যাচ্ছি! বেড নাম্বার থার্টি টু। ওই যে দক্ষিণ দিকের ব্লক। আপনারা সুপারিনটেন্ডেণ্টের ঘর থেকে খাতাপত্তর সই করে আসুন। কোনও ভয় নেই। চিয়ার আপ।

করিডর ধরে সুপারিনটেন্ডেণ্টের অফিসের দিকে যেতে যেতে মনে হল বিলেতের হাসপাতালে চলে এলুম না কি!

চারপাশ ছবির মত ঝকঝকে তকতকে। ডিসইনফেকট্যাণ্টের পরিচিত গন্ধ। পাশ দিয়ে সিস্টার আর ডাক্তাররা হেঁটে চলেছেন এমন ভাবে, যেন অনুপ্রাণিত হাঁটা। উদ্দেশ্যহীন প্রমোদভ্রমণ নয়। কোথাও উঁচু গলায় কথা নেই। এয়ার কণ্ডিশানিং প্ল্যাণ্টের ঝিরিঝিরি জল পড়ার শব্দ।

সুপারের ঘরে ঢুকতেই মুখ তুলে বললেন, আসুন। বসুন। আমি দেখেছি আপনারা এসেছেন।

কি করে দেখলেন! পরক্ষণেই বুঝতে পারলুম। প্রশ্নের প্রয়োজন হল না। সামনেই একটি ক্লোজড সার্কিট টিভির পর্দায় সারা হাসপাতাল ভাসছে।

ঘরে আর একজন ডাক্তার ছিলেন। সুপার তাকে বললেন, ব্যাপারটাকে আপনি ছোট করে দেখবেন না। আমরা এখানে মানুষের জীবন নিয়ে খেলা করতে আসিনি। জনসেবাই আমাদের প্রোফেসানের মন্ত্র, শপথ। আপনাদের আমি বলেছি, যত দিন না ডিসপোজেবল সিরিঞ্জ আসছে, ততদিন একটা করে ইনজেকসান দেবেন আর নিড্‌লটা খুলে ফেলে দেবেন। থ্রো অ্যায়োএ দি নিড্‌ল। নিড্‌ল বড়, না জীবন বড় ডক্টর সেন?

জীবন! কিন্তু প্রশ্নটা হল টাকার!

টাকার জন্যে কোনও ভালো কাজ আটকে থাকে না। চাই ইচ্ছে। উইল টু ডু। আমাদের দেশে পুলিস-খাতে কত ব্যয় হয়! ফরেন ট্যুরে কত টাকা যায়! তীর্থস্থানে এই যে

এত বড় বড় মন্দির তৈরি হয়েছে, কি ভাবে হয়েছে? সাধু সন্ন্যাসীরা টাটা বিড়লা নয়। সব হয়েছে মনের জোরে, অদম্য ইচ্ছায়। মানুষকে মানুষ ভাবতে শিখুন ডক্টর সেন। জমানা বদল গিয়া। এতকাল অর্থটাকেই আপন ভেবেছেন, স্বার্থকে ভেবেছেন অর্ধাঙ্গিনী। মানসিকতা পালটান। আমরা ঈশ্বরের কাছাকাছি চলে গেছি। চাঁদে আমাদের রকেট ল্যাণ্ড করেছে। মঙ্গলের পাশ দিয়ে হুস্ করে উড়ে গেছে। ডক্টর গাঙ্গুলীকে আপনি বাড়ি যেতে বলুন। এই প্রোফেসানের তিনি অযোগ্য। রুগীর দিকে যিনি হাসি-হাসি একটি মুখ তুলে ধরতে পারেন না, ধৈর্য ধরে রুগীদের তুটো কথা শুনতে যিনি বিরক্ত হন, হি হিমসেল্‌ফ ইজ এ রুগী।

ডক্টর সেন বললেন, এঁরা অপেক্ষা করছেন স্যার!

ও হ্যাঁ। আমি আজকাল বড় ভাবপ্রবণ হয়ে উঠছি। আপনারা যদি আমাকে একটু সাহায্য করতেন, সামান্য একটু কো-অপারেশান! আমাদের এই অবস্থাটা হল ঈশ্বরের টিথিং ট্রাবল। ঈশ্বর হবার মুখে মানুষের এই রকম হয়। অল-রাইট! আপনি ফার্স্ট ফ্লোরের সব কটা ল্যাভেটারি একবার ইনসপেক্‌ট করুন। তারপর একবার দেখে আসুন, ধোবী-খানার পেছনে কোনও উৎপাত জুটেছে কি না! বুঝতে পারছেন, কি বলছি। হাসপাতাল হল জীবনদায়িনী কারখানা। ভাং, জুয়া, ডিস্টিলারি! ভেঙে গুঁড়িয়ে দাও। দশ চক্রে ভগবান ভূত!

উত্তেজনায় দুম্ করে খাতা খুলে বললেন, সরি! একটু শব্দ হয়ে গেল! নিন বলুন, নাম, ঠিকানা, বয়েস, মেল, ফিমেল, ম্যারিট্যাল স্ট্যাটাস, বেকার না সাকার, আশ্রিতের সংখ্যা, মাসিক উপার্জন!

ঝট্‌ঝট্ সব লেখা হয়ে গেল। আমরা এখন তা হলে কি করব স্যার! কার্ডিয়াক ওয়ার্ডের বত্রিশ নম্বরে তা হলে যাই আমরা? বড় দুশ্চিন্তায় আছি।

যাবার প্রয়োজন নেই, এখানে বসেই দেখুন। ওয়ার্ডে বাইরের কাউকে আমরা আর অ্যালাউ করছি না। বাইরে থেকে কখনও তাঁরা ঝগড়া নিয়ে আসেন, সমস্যা নিয়ে আসেন, ভাইরাস নিয়ে আসেন, সামটাইম্‌স এক্‌সট্রিম কেসে অস্ত্রও নিয়ে আসেন। আমাদের সিসটেমটা এখন 'কাউন্টার-ডেলিভারি। কাউন্টারে রুগী জমা দিয়ে, কাউন্টারেই ডেলিভারি নেবেন। আচ্ছা, সি থার্টি টু।

প্যানেলে সারি সারি বোতামের ভেতর সুপার দেখে দেখে একটা টিপলেন। পর্দায় দাদা। বাপ্‌রে কি এলাহি ব্যবস্থা! দু'জন ডাক্তারবাবু, তিনজন নার্স, ঝক্‌ঝকে বেড। বেশ বোঝা গেল ই সি. জি হচ্ছে। মাথার দিকে অক্‌সিজেন সিলিণ্ডার।

সন্দেহ প্রকাশ করে ফেললুম, স্যার, সিলিণ্ডারে মাল আছে তো!

সুপার ইণ্টারকম তুললেন। পর্দায় দেখা গেল, একজন সিস্টারও রিসিভার তুললেন। সুপার বললেন, চেক সিলিণ্ডার।

আবার একটি সন্দেহের কথা বলে ফেললুম, স্যার আমার বাবার নাক থেকে অক্সিজেনের নল খুলে পড়ে গিয়েছিল, অ্যাণ্ড হি··।

হতে পারে, হতে পারে, অনেক সময় ভোঁতা নাক হলে, কি গোঁফ থাকলে ও রকম হয়। আমাদের দিশি স্টিকারও তেমন জোরদার নয়। সাবধানের মার নেই।

আবার ইণ্টারকম। ও প্রান্তে নির্দেশ গেল, দু'জন সিস্টার সারারাত দুপাশ থেকে দুটো নল ধরে বসে থাকবে। এবং তৃতীয় জন নজর রাখবে ওরা যেন ঘুমিয়ে না পড়ে। হ্যাঁ, আর একটা কথা, একটা বেডপ্যান এখন থেকেই দিয়ে রাখো। এর নাম দূরদর্শিতা। ভদ্রলোক শুনছি অফিস থেকে এসেই আক্রান্ত হয়েছেন, বাথরুমে যাবার সময় পাননি। আমার কথা হল, চাইতে যেন না হয়। জাস্ট লাইক নেমন্তন্ন বাড়ি। বারে বারে ঘুরিয়ে যাও। রিপিট অ্যাণ্ড রিপিট! ওকি ইনজেক্সান! নিড্‌ল নিড্‌ল। বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট নিড্‌ল।

ইণ্টারকম ছেড়ে দিলেন। ভয়ে বললুম, স্যার আমরা গরিব মানুষ, তিনজন নার্স, এই এলাহি ব্যাপার, এ তো স্যার অমিতাভ বচ্চন···

থামুন মশাই। শিক্ষা আর স্বাস্থ্য স্টেটের দায়িত্ব। রাশিয়ার কথা শোনেননি!

এটা তো স্যার রাশিয়া নয়।

ভালো কিছুর অনুকরণ কালে সাঁচ্চা হয়ে যায়। যান বাড়ি

যান। তেমন কিছু হলে মেসেঞ্জার যাবে। আচ্ছা, কেসটা কি খুব সিরিয়াস! টেঁসে যাবার চান্‌স আছে?

আজ্ঞে, হার্ট জিনিসটা তো ঠিক বোঝা যায় না, কখন কি করে বসে?

ঠিক ঠিক, দেহটা পুরুষের হলেও হৃদয় একেবারে মেয়েমানুষ। নাঃ রিশক না নিয়ে টপ্‌কে একবার রেফার করি। স্বাধীন দেশের একজন নাগরিক হীরের চেয়েও মূল্যবান।

সুপার রিসিভার তুললেন, হ্যালো, ডক্‌টর বাস্থলী, কি স্যার, রেস্ট নিচ্ছেন? আই অ্যাম সরি। কিন্তু উপায় নেই, আমি আপনার নির্দেশমত কাজ করতে বাধ্য। একটি মধ্যবিত্ত কার্ডিয়াক পেশেণ্ট, ফার্স্ট অ্যাটাক, স্ত্রী, একটি বাচ্চা। রাইট স্যার, বড়লোক, দুনম্বরী মাল নয়, খাঁটি মধ্যবিত্ত, অন্ন ভক্ষ্য ধনুর্গুণ, হ্যাঁ স্যার, মরলে ফ্যামিলি পথে বসবে। কী স্যার? অ, ভেবে হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। আপনি আসছেন, যে অবস্থায়, মানে পাজামা, অ, লুঙ্গি! শ্যাণ্ডো। প্যাণ্টটা স্যার গলিয়ে নিলে হত না! অ, সময়, হ্যাঁ হ্যাঁ, সময় একটা ফ্যাকটার। রাইট স্যার, আমি বাইরে আছি।

সুপার রিসিভার নামালেন। ভারতবর্ষের এক নম্বর আসছেন, তিন নম্বর একজন সিটিজেনের জন্যে। ভাবা যায় না।

টেবিলের তলায় আঁচড়াবার শব্দে সুপার নিচের দিকে তাকিয়ে লাফিয়ে উঠলেন, ব্যাটা, তুমি এইখানে! বাঘের ঘরে

ঘোগের বাসা, আমি তোমায় টিভিতে খুঁজছি, অ্যাণ্ড ইউ আর হিয়ার। শেষ কুকুর।

উত্তেজনায় সুপার সেই শেষ লেড়িটিকে দু'হাতে পাঁজা-কোলা করে তুললেন। দৃকপাত নেই। ঘ্যাঁক ঘ্যাঁক করে কুকুর কামড়াচ্ছে, তবু ছাড়ছেন না। দরজার দিকে এগোচ্ছেন আর বলছেন, জলাতঙ্কে মরি সেও ভালো, শেষ কুকুর আমি বিদায় করবই। আমি চাই কুকুর-মুক্ত পরিবেশ। ডগ-ফ্রি অ্যাডমিন্‌সট্রেশান। কামড়া, কামড়া। ব্যাক বাইট, ফ্রন্ট বাইট। আজ আর তোমায় ছাড়ছি না।

বাইরে এসে দুম্‌ করে কুকুরটাকে আছড়ে ফেললেন। শেষ লেড়ির শেষ চিৎকারে হাসপাতালের আকাশ কেঁপে গেল। আর সেই কাঁপন থামতে না থামতে, নীল আলোয় অন্ধকার চিরে এগিয়ে এল ডক্টর বাসুলীর গাড়ি।

ছুটি

বৃদ্ধ প্রসন্নবাবু ধুঁকতে ধুঁকতে বিরাট অফিসবাড়ির লিফটের সামনে এসে দাঁড়ালেন। চুল পেকে পাটের মত চেহারা হয়েছে। চারপাশে ঝুলে আছে এলোমেলো, বহু ব্যবহৃত ঝুলঝাড়ুর মত। চুলের আর অপরাধ কি? সারা জীবন মাথার ওপর দিয়ে কম ঝড়ঝাপটা গেছে! জীবনটাকে দাঁড়িপাল্লায় ফেললে, সুখের দিকে পড়বে ছটাকখানেক, বাকিটা দুঃখ। যখন যেখানে পা ফেলেছেন, সবই পড়েছে বেতালে। একেই বলে মানুষের ভাগ্য। সেই কথায় বলে না, ঘরাতে নেইকো ঘি, ঠকঠকালে হবে কি?

বগলে বগুচটা একটা ছাতা। হাতে একটা মার্কিনের ব্যাগ। ব্যাগে কিছু দরকারি কাগজপত্র, আর একটা চশমার খাপ। খাপে ময়লা একটা দু টাকার নোট, পথ খরচ। আর ছোট্ট একটা ঠোঙায় গুটিকয় বাতাসা। রক্তে চিনি কমে গেছে। ডাক্তারের নির্দেশ, মাথা ঘুরলেই, একটু চিনি খাবেন। চিনির যা দাম! ওই পথ চলতে চলতে মাঝে মধ্যে একটা দুটো বাতাসা ফেলে দেন মুখে।

লিফটের সামনে তেমন ভিড় নেই। অফিস অনেক আগেই বসে গেছে। লেটের বাবুরাও সব এসে গেছেন মনে হয়। আজকাল অফিস একটু কড়া হয়েছে। কাগজে পড়েছেন। সত্যি মিথ্যে জানেন না। লিফটের সামনে গন্ধটন্ধ মাখা একজন মহিলা দাঁড়িয়েছিলেন। ঘর্মাক্ত, রোদে পোড়া, সচল ঝুলঝাড়ু-সদৃশ প্রসন্নবাবুকে দেখে তিনি একটু সরে দাঁড়ালেন। প্রসন্নবাবু মনে মনে হাসলেন। মা জননী, জীবনের বসন্ত বড় ক্ষণস্থায়ী। হেসে নাও, হেসে নাও, দু'দিন বই তো নয়! ওই চুল পাকবে, গোলাপী গাল কোল্‌ডস্টোরে রাখা আপেলের মত ধেসকে যাবে। সরু কোমরটি হবে হাতির গোদা পায়ের মত।

ওপর থেকে লিফট নেমে এল নিচে, লাল আলোর অক্ষর কমাতে কমাতে। জীবনটা যদি লিফটের মত হত! উলটো হাতল ঘুরিয়ে বয়েসটাকে কমাতে কমাতে শূন্যে নিয়ে আসতেন। আবার মাতৃজঠরে। আবার ভূমিষ্ঠ। অন্নপ্রাশন। তারপর বেশ হিসেব করে দুঁদে ছেলের মত বড় হওয়া, ফার্স্ট ফ্লোর, সেকেণ্ড ফ্লোর, টপ ফ্লোর। একেবারে টঙে উঠে, রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে নিচের দিকে তাকাতেন। সব ক্ষুদি ক্ষুদি মানুষ, পৃথিবীর পিঠে যেন পোকা ঘুরছে।

সাত নম্বর তলায় লিফট থেকে নেমে পড়লেন তিনি। সেই পুরনো কর্মস্থল। সব এখন পালটে গেছে। বেশির ভাগই নতুন মুখ। কেউ তাঁকে চেনে না। যারা চেনে,

তারাও যেন না চেনার ভান করে। একজন মানুষ রিটায়ার করে চলে গেলে, তাকে আর মনে রেখে লাভ কি! তার কাছ থেকে কি আর পাওয়া যাবে, দুঃখের কাঁদুনি ছাড়া। উলটে বরং যাবে। এক কাপ চা ভদ্রতা করে খাওয়াতে হলে, এ বাজারে তিরিশটা পয়সা। ওর সঙ্গে কুড়িটা পয়সা জুড়লে এক পিঠের বাসভাড়া।

লম্বা হলঘরে সেই পরিচিত অফিস এখন কত অপরিচিত! ঘিঞ্জি, নোঙরা। কোনও যেন ছিরিছাঁদ নেই। ক্যাডাভ্যারাস। যে যেখানে পেরেছে, একটা করে টেবিল চেয়ার পেতে বসে পড়েছে। কিছু টেবিল নতুন। কিছু সেই বৃটিশ আমলের। আকার, আকৃতি দেখলেই ডায়ার কিম্বা টেগার্টের কথা মনে পড়ে। যে অফিস দেখে এখন ঘৃণায় নাক সিঁটকোচ্ছেন, সেই অফিসেই সারাটা জীবন ফাইল নেড়ে অক্লেশে কাটিয়ে গেছেন। প্রথম দিকে এ অফিসও ছিল না। যুদ্ধের পর একটা ভাঙা টিনের চালার তলায় অফিস বসত। গ্রীষ্মে জীবন বেরিয়ে যেত। মাথার ওপর হাণ্ডা পাখা ক্যাঁচোর ক্যাঁচোর শব্দে গরম বাতাসের ন্যাজ নাড়ত। ছাতা ধরা কুঁজোয় জল। নোংরা টুলের ওপর একপাশে কেতরে থাকত। মুখে একটা পিচবোর্ডের ঠুলি। সারাদিন কাজ করো, আর ঢোঁকর ঢোঁকর জল খাও। সে সময় অফিসে তবু কাজ হত। ডাক্তার রায়ের আমল। নিজে স্বপ্ন দেখতেন, অন্যকেও সেই স্বপ্ন দেখাতে জানতেন। বড় বড় পদে বেশ কিছু স্বদেশী-করা মানুষ ছিলেন। সাধারণ

মানুষের সঙ্গে তাঁদের যোগ ছিল। কাজে গাফিলতি হলে জবাবদিহি করতে হত। সাসপেনসান কিংবা ট্রানসফারের ভয় ছিল। কাগজে কোনও দফ্‌তরের সামান্যতম সমালোচনা হলে ফাটাফাটি হয়ে যেত। তুলকালাম কাণ্ড শুরু হয়ে যেত। তখন অফিসে অফিসে এত সুন্দরী মহিলা ছিল না। টেবিলে টেবিলে প্রেমালাপ ছিল না। প্রজাপতি উড়ত না ফুরফুর করে। ঘুসঘাস ছিল না, থাকলেও খুব সামান্য, খুব লুকিয়ে-চুরিয়ে, জায়গা-বিশেষে। ধীরে ধীরে চোখের সামনে সব যেন কেমন হয়ে গেল! স্বাধীনতা যত পুরনো হতে লাগল দেশটা যেন পচে ফুলে উঠল। চিকিৎসার বাইরে চলে গেল সব। নতুন বাড়িতে অফিস এল। কর্মচারীর সংখ্যা বাড়ল জোয়ারের জলের মত। অসংখ্য কেতাদুরস্ত অফিসার। কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা। ফাইলই বাড়ল। দেশ যে তিমিরে সেই তিমিরে।

দরজার মুখে দাঁড়িয়ে প্রসন্নবাবু দূর কোণের দিকে তাকালেন। তিনি যে চেয়ারে, যে জায়গায় শেষ বসে গেছেন সেখানে একজন হৃষ্টপুষ্ট মহিলা এসেছেন। খেঁকুরে প্রসন্নর জায়গায় ভরভরন্ত রমণী। কাঁধকাটা ব্লাউজ বেয়ে পাইথনের মত হাত নেমেছে। যাকে যখন ধরবেন তার আর নিষ্কৃতি নেই। মুখটি যেন তিল ফুলের, নীল শাড়ি, ফর্সা রঙ, কোণটা যেন আলো হয়ে আছে। বয়েস হয়েছে, চোখে চালশে, শরীর চকচকে, দু'পা হাঁটলে হাঁপ ধরে, তবু মেয়েছেলে দেখার চোখ

সরে না। মানুষ একটা জীব বটে! যত দুর্ভোগ বাড়ে, তত ভোগের আকাঙ্ক্ষাও বাড়ে। বাবু প্রসন্ন, স্থির হও।

প্রসন্নবাবু নিজেকে উপদেশ দিয়ে, সরাসরি টেবিলের মাঝখান দিয়ে অশোক বসুর আসনের দিকে এগোতে লাগলেন। অশোক বসুই এখন একমাত্র ভরসা। রিটায়ার করেছেন প্রায় তিন বছর হল, এখনও পেনসান পেপার তৈরি হল না, প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা ফেরত পেলেন না। আর কয়েক মাস পরেই মেজ মেয়ের বিয়ে। কথাবার্তা প্রায় পাকা হয়ে এসেছে। দর কষাকষি চলছে। রফা একটা হবেই। মেয়ে যখন, আইবুড়ো তো আর ফেলে রাখতে পারেন না। জীব-ধর্ম বলে কথা!

প্রসন্নবাবু অশোক বসুর টেবিলের সামনে এসে মৃদু গলায়, ভয়ে ভয়ে ডাকলেন, 'বাবা, অশোক'। বয়েসে অনেক ছোট। ছেলের বয়সী। বাবা ছাড়া আর কি বলবেন! বড় স্নেহের ডাক। বয়োকনিষ্ঠদের আজকাল তিনি এইভাবেই ডাকেন। এর মধ্যে তেমন কোনও স্বার্থ নেই। যে বয়েসে এসে ঠেকেছেন সে বয়েসে স্বার্থের কথা আর তেমন করে ভাবা যায় না। এখন সব জিনিসই, হলে হবে, না হলে না হবে। হিসেবের খাতার শেষ পাতায় দেনা-পাওনার অঙ্ক মেলাতে বসলে চোখ খুলে যায়। সারা জীবন পেতে হবে, পেতে হবে করে, কি পেয়েছেন! এ যেন আমবাগানে আম কুড়োতে গিয়ে কোঁচড় ভর্তি ইটের টুকরো নিয়ে ফেরা। সেই দেনেঅলা

মালিক একজন। তিনি যাকে দেন, তাকে ছপ্পর ভরে দেন। যাকে দেন না, তাকে কিছুই দেন না, এমন কি তার পাওনা টাকা, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, গ্র্যাচুইটি, পেনসান সব আটকে রেখে দেন। ঘুরে, ঘুরে, ঘুরে, ঘুরে, জুতোর শুকতলা ক্ষয়ে যায়। কত অসহায় প্রাণী এই সামান্য জাগতিক আকর্ষণে ভূত হয়ে, বড় বড় অফিসবাড়ির কার্নিশে ঠ্যাং ঝুলিয়ে বসে আছে। সুযোগ পেলেই বড়বাবুর কানের কাছে, খোনা খোনা গলায়, বাতাসের সুরে বলে বায়, বঁড়বাঁবু, আঁমাঁর পেঁনসাঁন, আঁমাঁর ফঁভিঁডেঁণ্ট ফাঁণ্ড। বড়বাবু ভাবেন, কি যেন একটা শুনলুম। কানের পাশে হাত নেড়ে মাছি তাড়াবার মত, শব্দটাকে উড়িয়ে দেন, ও কিছু নয়, মনের ভুল। যারা মানুষ খুন করে, তারাও মাঝরাতে অনেক অশরীরী শব্দ শুনতে পায়, তুমি আমায় মারলে, তুমি আমায় বিধবা করলে, শিশুর আর্তনাদ, নারীর আর্তনাদ, যুবকের মৃত্যুকালীন চিৎকার, কণ্ঠনালির উন্মুক্ত ভাগ দিয়ে বেরিয়ে আসা, বাতাস আর রক্তের ঘড়ঘড় শব্দ। তারা গ্রাহ্য করে না। শোনার মত না-শোনাতেই অভ্যস্ত হয়ে যায়! সাধনায় কি না হয়?

একটা শতচ্ছিন্ন, বোস পুরনো ফাইল খুলে, অশোক বসু ধ্যানস্থ ছিলেন। হয় তো লর্ড ক্লাইভের আমলের কোনো কেস। আজও যার ফয়সালা হয়নি। দু'পক্ষে চিঠ-চাপাটি চলছে তো চলছেই। অনন্ত কাল চলবে। আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এ যুগের স্লোগানই হল, চলছে চলবে। অশোক বসু

বিরক্তি-ভরা গম্ভীর মুখ তুলেই, প্রসন্নবাবুকে দেখে বিগলিত হাসিতে গলে একেবারে মাখমের মত হয়ে গেলেন। প্রসন্নবাবু বড় অবাক হলেন। এখানকার আকাশে তো কোনও দিন সূর্যোদয় দেখেননি? আজ হঠাৎ কি হল! উনি যা শুনবেন ভেবেছিলেন, তা হল, অ, আবার এসেছেন? আপনার তাগাদায় মশাই অফিসে তিষ্ঠনোই দায় হল। ক'বছর হল মশাই? মাত্র তিন বছরেই হেদিয়ে গেলেন! পেনসান পেপার তৈরির ঝামেলা জানেন? আর প্রভিডেন্ট ফাণ্ড! সে মশাই আমাদের হাতে নেই। আমরা পাঠিয়েছি। ভাগ্যে থাকলে আজও হতে পারে, আবার দশবছর পরেও হতে পারে। আপনার এখন মনে করুন গর্ভাবস্থা চলছে। সময় হলে ডেলিভারি হবে। টানা হ্যাঁচড়া করলে, তিন তরফেরই বিপদ। প্রসূতি মরবে, বাচ্চা মরবে, জেলে যাবে গাইনি।

অশোক বললেন, বসুন, বসুন। অঃ বাইরে আজ ভীষণ রোদ। চোখ মুখ কালো হয়ে গেছে। আহা শরীরটা একেবারে ভেঙে গেছে। এ দেশে বৃদ্ধরা বড় অবহেলিত। হালের বলদের মত। যতদিন শক্তি, ততদিন খাতির। যেই বসে গেল, টানতে টানতে নিয়ে যাও কষাইখানায়।

প্রসন্নবাবুর সামনের চেয়ারে বসতে বসতে অবাক হয়ে পুত্রোপম ছেলেটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। এই শুষ্ক পৃথিবী কি আবার জলসিক্ত, স্নেহসিক্ত, করুণাসিক্ত, বড় নির্ভর একটি স্থান হয়ে উঠল না কি! মানুষ মানুষের কথা ভাবছে! চোখে

জল এসে গেল। সকালেই পরিবারের সঙ্গে এক পক্কড় হয়ে গেছে। টাকার জোর না থাকলে সংসার এক বিতিকিচ্ছিরি জায়গা। এ যেন মুদিখানার দোকান। স্নেহের কিলো একশো টাকা, মমতা দেড়শো টাকা, সেবা দুশো টাকা, ভালোবাসা পাঁচশো টাকা। দাঁড়িপাল্লায় বাটখারা চাপিয়ে লেনা-দেনা। মানুষ তাই নিয়েই মেতে আছে। জুতো, ঝ্যাঁটা, লাথি খেয়েও মরার সময় হাতে পায়ে ধরাধরি, আরও কিছুকাল, আরও কিছুকাল।

অশোক বসু গলা চড়িয়ে কাকে যেন বললেন, এক গেলাস ঠাণ্ডা জল দিয়ে যাও।

প্রসন্নবাবু অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন, ছেলেটা রাতারাতি অন্তর্যামী হয়ে গেল না কি? তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে। ঠিক টের পেয়েছে তো?

শুধু জল নয়। জলের পর চা এসে গেল। কাপের দিকে হাত বাড়াতে ইতস্তত করছিলেন। কে জানে বাবা, কার জন্যে চা এসেছে? আগে তো কখনও এমন হয়নি!

চায়ের কাপটা প্রসন্নবাবুর দিকে সামান্য একটু ঠেলে দিয়ে অশোক বসু বললেন, নিন চা খান। চা খান। গ্রীষ্মের তেষ্টা জলে যাবার নয়। গরম চা না খেলে মিটবে না।

প্রসন্নবাবু কাঁপা কাঁপা হাতে ঠোঁটের কাছে কাপ তুললেন। পানসে চা। তবু চা তো! এক চুমুক মেরেই থমকে গেলেন। পুরনো দিনের একটা ঘটনা মনে পড়ল:

সেন সায়ের বলে এক সায়েব এসেছিলেন এই অফিসে। বেশ মিহি চেহারা, মিহি গলা। অর্থনীতির এম. এ.। মানুষকে বড় অদ্ভুত কায়দায় তিনি অপমান করতেন। জনৈক মন্ত্রীর এক আত্মীয়কে নিয়োগপত্র ছাড়তে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয়ে গিয়েছিল। একদিন কি দু'দিন হলে কিছু বলার ছিল না। মাত্র বারো ঘণ্টা দেরি হয়েছিল। সেন সায়েব ডেকে পাঠালেন। ঘরে ঢুকতেই বললেন, 'আসুন, আসুন। কতদিন আপনাকে দেখিনি। কাজে ব্যস্ত থাকেন আপনি। বুঝতেই পারি, নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ থাকে না। আপনাদের মত সিনসিয়ার কিছু কর্মী আছে বলেই প্রশাসন এখনও ভেঙে পড়েনি। আরে দাঁড়িয়ে কেন, বসুন, বসুন।'

বেল টিপে বেয়ারা ডেকে বললেন, 'এক কাপ চা নিয়ে এসো।' চা এসে গেল। প্রসন্নবাবু ভয়ে ভয়ে একটি চুমুক মারলেন। খুব সাবধানে যাতে কোনও রকম শব্দ না হয়। দ্বিতীয় চুমুকের জন্যে কাপটাকে সবে ঠোঁটের কাছে এনেছেন, সেন সায়েব পাইপ চিবোতে চিবোতে বললেন, 'কত বয়েস হল আপনার?'

কাপ থেকে ঠোঁট সরে এলো, প্রসন্নবাবু বললেন, 'আর বছর দুই বাকি আছে।'

'তার মানে বুড়ো-হাবড়া হয়ে গেছেন। ভীমরতি ধরেছে।'

প্রসন্নবাবু আত্মরক্ষার জন্যে সামান্য প্রতিবাদের স্বরে বললেন, 'আজ্ঞে না, ভীমরতি ধরবে কেন? এখনও বেশ শক্ত সমর্থই আছি।'

'বয়েস কত বছর কমিয়েছেন?'

'এক বছরও না।'

'ছেলে মেয়ে কটি?'

'দুই ছেলে এক মেয়ে।'

'সেদিকে হিসেব ঠিক রেখেছেন অ্যাঁ!'

'তার মানে স্যার?'

'এদিকে অপদার্থ হলেও ওদিকে বেশ পদার্থ আছে, কি বলেন?'

'আপনি কী বলছেন ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'তা পারবেন কেন? ইনক্রিমেণ্টটি বন্ধ করে দিলে বুঝতে পারবেন, কত ধানে কত চাল?'

'আমার তো স্যার আর ইনক্রিমেণ্ট নেই। স্কেলের শেষে বহুদিন হল পৌঁছে গেছি।'

'এবার তা হলে দয়া করে ভেগে পড়ুন না। চেয়ার দখল করে বুড়ো হাবড়ারা আর কতকাল বসে থাকবে। কিছু ইয়াং ছেলে না এলে চাকায় যে জং ধরে গেল।'

অশোক বসুর পেছনে তামাটে আকাশে সন্ধানী চিল উড়ছে। রোদের প্রখর তাপে গাছপালা ঝিমিয়ে পড়েছে। পুরনো দিনের কথা ভেবে চায়ে চুমুক দিতে আর সাহস হচ্ছে না। বলা যায় না অতীত আবার ফিরে আসতেও পারে।

ছেঁড়া ফাইলটা বাঁধতে বাঁধতে অশোক বসু বললেন, 'সামনের মাসেই যাতে আপনি পেনসান ড্র করতে পারেন সে

ব্যবস্থা আমি করব। আর এক মাসের মধ্যেই আপনি প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড আর গ্র্যাচুইটির টাকা অবশ্যই পাচ্ছেন। মেয়ের বিয়ের দিন পাকা হল ?'

'দর কষাকষি চলছে পাত্রপক্ষের সঙ্গে। ছেলেটি ভালো। যা বাজার দর তা দেবার ক্ষমতা আমার নেই।'

'কিছু ভাববেন না। ঈশ্বরের ইচ্ছেয় সব হয়ে যাবে। আপনি সৎ মানুষ। আপনাকে কেউ আটকাতে পারবে না।'

প্রসন্নবাবু করুণ কণ্ঠে বললেন, 'বাবা অশোক, এ সব কথার কথা নয় তো! সত্যিই হবে ?'

'আপনি দেখুন না, হয় কি না! আর আপনাকে ঘুরতে হবে না। আমারও মেয়ে আছে প্রসন্নদা, আমাকেও একদিন রিটায়ার করতে হবে। ঘুঁটে পুড়লে গোবরের হাসা উচিত নয়।'

বিবর্ণ ছাতাটি বগলে নিয়ে প্রসন্নবাবু উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, 'ভগবান তোমার মঙ্গল করুন বাবা।' অশোক বসু প্রবীণ মানুষটিকে সম্মান জানাবার জন্যে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। হাসতে হাসতে বললেন, 'আমি ভালো করলে তবেই না আমার ভালো হবে ? প্রসন্নদা, একদিন সকলকেই যেতে হবে। এখানকার বিচার এখানে না হলে ওখানে গিয়ে হবেই। সেখানে ঘুষ চলে না। খুঁটি ধরে পার পাওয়া যায় না।'

চারপাশে তাকাতে তাকাতে প্রসন্নবাবু দরজার দিকে চললেন। চেনাজানা যাঁরা ছিলেন, তাঁরা সকলেই যেচে যেচে

কুশল প্রশ্ন করতে লাগলেন। প্রায় সমসাময়িক হরেনবাবু জড়িয়ে ধরে বললেন, 'আমারও যাবার সময় হল রে! আর এক মাস। বয়েসটা না ভাঁড়ালে তোর সঙ্গেই যেতে হত। তুই তো সাধু, তোর কথাই আলাদা। আমরা ছিলুম ম্যানেজ-মাস্টার। তা ভাই ম্যানেজ করে কি আর হোলো। বছর কয়েক দাসত্বের কাল বাড়ল। সেই তো মাথা হেঁট করে যেতেই হবে!'

সহকর্মী হরেন উদাস মুখে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন। বগলে বিবর্ণ ছাতাটি চেপে ধরে প্রসন্ন বললেন, 'দাসত্বই আমাদের জীবন রে ভাই। এই বাড়ি যেদিন আমাদের ছুটি বলে বাইরে বের করে দিয়েছে, সেদিন থেকে আমরা জীবনেরও বাইরে চলে গেছি। কিছুই আর করার নেই, শুধু দিন গোনা। ক্যালেণ্ডারের পাতা ওলটানো।'

'নতুন ভাবে বাঁচা শিখতে হবে। একটা কিছু করতে হবে।'

'কিছুই করার নেই রে ভাই। ভাবনাটাই শেষে মরে যায়। জীবনটাই যে পুরনো হয়ে গেছে। পৃথিবীতে শুধু যৌবনের আয়োজন। আমরা স্টেজের বাইরের চরিত্র এখন। দর্শকের আসনে বসে থাকা। আমরা তো তেমন বড় হতে পারিনি, একেবারেই মিডিয়কার। কীর্তনের দলের দোহার দেখেছিস? মূল গায়েন গাইলে, রাধার এ কি হোলো। দোহাররা অমনি গেয়ে উঠল, এ কি হোলো। আমরা হলুম সেই দোহার। এ কি হোলো করার জন্যেই জন্মেছি।'

প্রসন্ন অফিসের বাইরে রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন। শহর যেন রোদের উত্তাপে পরিশ্রান্ত বলদের মত ধুঁকছে। ট্রাম চলেছে নড়বড়, নড়বড় করে। যৌবনে এই সময়টায় তিনি অফিসের বাইরে টিফিন করতে বেরোতেন। চারপাশে সবই রয়েছে, সেই কাটাফল, চিঁড়ে, মুড়ি, ছোলা, বাদাম ভাজা। আখের রস। তেলেভাজা, আলুর চপ, জিলিপি। সার সার মিষ্টির দোকান, পান, সিগারেট, ঠাণ্ডা জল। সবই সেই আগের মত। নাটক চলছে, চলবে। এক প্রসন্ন যায়, তো শত প্রসন্ন আসে। জীবন অনেকটা পায়ের কড়ার মত। যতই কাটো না কেন, আবার ঠিক গজাবে।

এই সব ভাবতে ভাবতে রাজভবনের সামনে দিয়ে বৃদ্ধ প্রসন্ন টুকটুক করে হেঁটে বাসরাস্তার দিকে এগোতে লাগলেন। আজ আর তেমন হতাশ বোধ করছেন না। টাকা কটা পেলে মেয়েটাকে সামনের শীতেই পার করবেন। আর বহু দিনের ইচ্ছে, হরিদ্বারটা একবার ঘুরে আসবেন। সুষমারও যেমন বরাত!

সেই চড়চড়ে রোদে, পিচগলা রাস্তায় হঠাৎ বউয়ের কথা মনে পড়ল। কম সহ্য করেছে! বেচারা আর পারে না। বয়েস বেড়েছে। নানা রকম মেয়েলি রোগে ধরেছে। মেজাজ তো একটু খিটখিটে হবেই! কত আর খরচ হবে, হাজার, দু'হাজার! সস্ত্রীক ঘুরে আসবো হরিদ্বার, দেরাদুন, মুসৌরী। শরীর নিলে, কেদারনাথ। জীবনে একবার, মাত্র একবার

সঞ্চিত অর্থের বেহিসেবী খরচ। বেহিসেবী কেন? এ তো আমার উপার্জন। মৃত্যুর পূর্ব-মুহূর্তে চোখের সামনে ভাসতে থাকবে তুষারশুভ্র হিমালয়। সংসার নয়, জীবনের চাওয়া, পাওয়া, না-পাওয়া নয়, স্যাঁতসেঁতে দেয়াল নয়, হিমালয় দেখতে দেখতে নিঃশব্দে সরে পড়া।

হাওড়াগামী একটা ভিড় বাসে টুক করে লাফিয়ে উঠলেন। হিমালয়ের কথা ভেবেই বাতাক্রান্ত পায়ে কেমন জোর এসে গেছে। বগলের ছাতা কণ্ডাক্টারের কোমরে খোঁচা মেরেছে। শঙ্কিত হলেন। এই সামান্য অসাবধানতার ফলে কত কথাই না শুনতে হবে। খিস্তি করে ভূত ভাগিয়ে দেবে। কেরানীর কি যে অভ্যাস! সারা জীবন বগলে ছাতা, হাতে একটা নরম কাপড়ের ঝোলা ব্যাগ! সাধে লোকে কেরানীকে ঘেন্না করে!

কাণ্ডাক্টার ছেলেটি কিন্তু কিছুই বলল না। বরং ভেতরে এগিয়ে যেতে সাহায্য করল। অবাক হলেন। এমন তো আজকাল হবার নয়। এখন তো তেরিয়া-মেরিয়ার যুগ। ভেতরে ঢোকার সময় আর এক প্রস্থ অবাক হবার পালা। ঢুঁ মেরে, গোঁত্তা মেরে, পায়ে পায়ে জড়াজড়ি করে, এপাশ থেকে ওপাশ থেকে ছোঁড়া তীক্ষ্ণ বাক্যবাণ সহ্য করতে করতে, বাসের, তবু ওরই মধ্যে নিরাপদ মধ্যাঞ্চলে যেতে হল না। যাত্রীব্যূহ মন্ত্রবলে যেন দু'ভাগ হয়ে গেল, যেন সেই যমুনা। বৃদ্ধ প্রসন্ন কৃষ্ণ-কোলে নন্দের মত অক্লেশে ঢুকে গেলেন। শুধু তাই নয়, বেশ রাগী রাগী চেহারার স্বাস্থ্যবান একটি যুবক সরে

গিয়ে, সুন্দর এবং সুস্থভাবে দাঁড়াবার মত জায়গা ছেড়ে দিলেন।

বাস চলেছে। প্রসন্নবাবু চলেছেন। একটা হাত ছাতা সামলাচ্ছে, আর একটা হাত টাল সামলাচ্ছে। অসুবিধে হচ্ছে। হলেও কিছু করার নেই। এই ভাবেই যেতে হবে। মধ্যবিত্ত মানুষকে কোন্ সরকার এর চেয়ে বেশি সুখে রাখবে! ইংরেজ রেখেছিল। সে সময় দেশ বড় ছিল। জনসংখ্যা কম ছিল। ভয়ও ছিল সমালোচনার। সামনের আসনের পাশের দিকে যে যুবকটি বসেছিল, সে হঠাৎ বললে, 'আপনার ছাতা আর ঝোলাটা আমার হাতে দিয়ে, দু'হাতে ভালো করে ধরে দাঁড়ান।'

প্রসন্নবাবু নির্দেশ পালন করলেন। এ এমন কিছু অবাক প্রস্তাব নয়। শহরবাসী যত স্বার্থপরই হোক, এটুকু এখনও করে। এতেও অবশ্য স্বার্থ আছে। মুখের কাছে, কাঁধের কাছে, হাঁটুর কাছে কিছু ঠেকলে অস্বস্তি হয়। যুবকটি হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'আপনি বসুন।'

'কেন বাবা! তুমি নামবে?'

'না নামবো কেন? আপনি বসুন। আপনাকে ভীষণ ক্লান্ত দেখাচ্ছে। গরমে ঘামছেন। বসলে একটু বাতাস পাবেন।'

'না, বাবা, না, তুমি বোসো। আমি বেশ আছি।' প্রসন্নবাবু কাতর কণ্ঠে বললেন। কারুর দয়া তিনি চান না। নিজের জোরে বাঁচতে চান।

ছেলেটি শুনলো না। জোর করে বসিয়ে দিল। 'আমার দাঁড়াবার বয়েস। আপনি পিতৃতুল্য। আপনি বসলে আমার শান্তি।'

'এসব আজকাল কেউ আর মানে না বাবা!'

'আজ না মানুক একদিন আবার মানতে হবে। এখন সব নেশায় আছে। ঘোর একদিন কাটবেই।' ছেলেটির কথা শুনে প্রসন্নবাবুর চোখে জল এসে যাবার উপক্রম হল। আজ পৃথিবীর হল কি! সিন্দুকের ডালা খুলে পুরনো দিনের সব অলঙ্কার বেরিয়ে পড়ছে না কি! জড়োয়ার কাজ করা সাবেক কালের বেনারসী, টায়রা, বাজুবন্ধ, চন্দনকাঠের জাফরি টানা ময়ূর পাখা। মানুষে মানুষ তা হলে আবার ফিরে আসছে!

প্রসন্নবাবু যার পাশে বসলেন, তিনি একজন গোলগাল মধ্যবয়সী মানুষ। তিনি আরও অবাক করে দিয়ে বললেন, 'জানালার ধারে বসবেন? আরও বেশি হাওয়া পাবেন।'

প্রসন্নবাবু তাড়াতাড়ি বললেন, 'না ভাই, এই বেশ আছি। আপনাকে ধন্যবাদ।'

'যাবেন কতদূর?'

'কদমতলা।'

বাস ব্রিজে উঠে পড়ল। গঙ্গার ফুরফুরে বাতাস আসছে। বাসের ভুলুনিতে ঢুল ধরছে। একবার বোধ হয় পাশের ভদ্রলোকের ঘাড়ে পড়ে গিয়েছিলেন। তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে গালাগালি খাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে রইলেন। ভদ্রলোক

কিছুই বললেন না। স্নেহমিশ্রিত দৃষ্টিতে শুধু একবার তাকালেন।

কদমতলায় নেমে দু'পা এগোতে না এগোতেই, পেছন থেকে একটা মটোর গাড়ি এসে পাশে দাঁড়াল। চালকের আসন থেকে মুখ বাড়িয়ে একজন বললে, 'জ্যাঠামশাই, উঠে পড়ুন।'

ছেলেটির নাম মোহর। বড় লোকের ছেলে। অসীম প্রভাব-প্রতিপত্তি। যেচে কোনওদিন কথাই বলেনি। এভাবে গাড়ি থামিয়ে লিফট দেওয়া তো দূরের কথা! প্রসন্নবাবু সামনের আসনে ভয়ে ভয়ে উঠে আড়ষ্ট হয়ে বসলেন। জীবনে একবার না দুবার মটোর চেপেছেন। মটোরে চাপারও কায়দা আছে। গুড়ি মেরে, শরীরটাকে সামনে ঠেলে, পাশে মোচড় মেরে আসনে ফেলতে হয়, তারপর পা-টিকে টুক করে ভেতরে তুলে নিতে হয়। দরজা বন্ধ করারও কায়দা আছে! প্রসন্নবাবুর মাথা ঠুকে গেল। ছাতি আটকে গেল, অনেকটা হুমড়ি খেয়ে ভেতরে এলেন। লজ্জার ব্যাপার! সারা জীবন বড়লোক থেকে শতহস্ত দূরে থেকেছেন। আজ একেবারে পাশাপাশি। মোহরের অঙ্গ থেকে বেশ একটা সুবাস বেরোচ্ছে। পাশে পড়ে আছে দামী সিগারেটের প্যাকেট। সোনালী লাইটার। পেছনের আসনে কি একটা শুইয়ে রেখেছে, টুংটাং শব্দ হচ্ছে।

রাস্তার দিকে চোখ রেখে গাড়ি চালাতে চালাতে মোহর বললে, 'দু'এক দিনের মধ্যে বাবা বোধ হয় আপনার সঙ্গে দেখা করবেন।'

'কেন বলো তো?' প্রসন্নবাবু ভয় পেলেন। বড়লোক তো অকারণে কিছু করেন না। তাঁদের সময়ের অনেক দাম! পূর্বপুরুষের রেখে যাওয়া কোনও দেনা নেই তো! এত দিনে হয়তো খুঁজে পেয়েছেন।

মোহর বললে, 'যদ্দূর মনে হয়, বাবা একজন সৎ মানুষ খুঁজছেন। আমরা যে ব্যবসা করি, সেই ধরনের ব্যবসায়ীদের একটা সমিতি আছে। সেই সমিতিতে উনি অ্যাকাউন্টেন্ট হবার জন্যে আপনাকে অনুরোধ করবেন। অনেক দিন ধরেই ভাবছেন, আপনার জন্যে একটা কিছু করা দরকার। আমাকে দু'তিন দিন বলেছেন। আজ আপনি বাড়ি আছেন?'

'আমি তো সব সময়েই বাড়িতে। কোথায় আর যাবো বাবা!'

'তা হলে আজই আসবেন, ধরুন আটটা থেকে নটার মধ্যে।'

বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে মোহর চলে গেল। প্রসন্নবাবুর মনে হল, শরীরে বেশ বল পাচ্ছেন। যে মাটির ওপর দাঁড়িয়ে আছেন, সে মাটি আর তেমন টলছে না। মোহরের পিতা জহরবাবু সত্যিই যদি একটা চাকরি দেন, তাহলে সেই ইচ্ছেটাকে মনের সুপ্ত কোণ থেকে আর একবার টেনে বের করে আনবেন। ছোট্ট একটি মাথা গোঁজার ঠাঁই। জীবনে বড় বাগানের শখ ছিল। এক টুকরো জমি পেলে ফুলের হাসি দেখতেন। দু'পাশে দুটি মন্দির ঝাউ। এক চিলতে পথ। নানা বর্ণের জবা। টগর। মল্লিকা। শীতে প্রজাপতি উড়বে।

বসার ঘরে এক প্রৌঢ় বসে আছেন। সামনে গেলাস। চায়ের কাপ। পেছন থেকে দেখে বুঝতে পারেননি। বেশ সম্পন্ন ব্যক্তি। আঙুলের আঙটিতে আলো খেলছে। সামনে এসে চিনতে পারলেন। শিশিরবাবু। সাঁতরাগাছির সেই শিল্পপতি। এঁরই ছেলের সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ের দুরাশা এখনও নাড়াচাড়া করছেন। বিজ্ঞাপন মারফত যোগাযোগ। মেয়ে পছন্দ হয়েছে। পছন্দ না হয়ে উপায় নেই। প্রসন্ন, তোমার মেয়েভাগ্যটি বড় ভালো! একথা সারা জীবন তিনি শুনে এলেন। মেয়েটিকে দেখে নিজেরও তাই মনে হয়। ভুল করে অথবা শখ করে এক রাজকুমারী এই দুঃখের সংসারে এসে পড়েছে।

'কি সৌভাগ্য! কতক্ষণ এলেন?' প্রসন্নবাবু হাত জোড় করলেন। মেয়ের পিতার যেমন করা উচিত।

শিশিরবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে বললেন, 'আরে আসুন আসুন। বেশ কিছুক্ষণ এসেছি। বসুন, বসুন, খুব গুরুতর কথা আছে।'

প্রসন্নবাবু ছাতিটিকে মেঝেতে শুইয়ে রেখে ভয়ে ভয়ে চেয়ারে বসলেন। কি এমন কথা! একটা শুকনো ছোট্ট একটি পাতার কুঁড়ি মুখ তুলেছিল, আজ বোধ হয় সেটিও শুকিয়ে গেল। গরিবের দুরাশায় যতই জল ঢাল, কিছুই হবার নয়।

শিশিরবাবু উল্লাসের গলায় বললেন, 'প্রস্তুত!'

'আজ্ঞে হ্যাঁ প্রস্তুত।'

'কি বলুন তো ?'

'আজ্ঞে, হয়ে গেল। যা হবার নয়, তা হবার নয়।'

'খুব বুঝেছেন যা হোক। বাড়িতে পাঁজি আছে ? শুভস্য শীঘ্রং।'

'পাঁজি ? শুভ ? কি বলছেন আপনি ?'

'সামনের শ্রাবণেই। শীতের জন্যে আমি আর অপেক্ষা করব না।'

'তার মানে ? আমি ঠিক বুঝতে পারছি তো ?'

'হ্যাঁ ঠিকই বুঝেছেন। আমার কোনও দাবি নেই। যা দেবেন। শাঁখা-সিঁদুর হলেও আপত্তি নেই। ওই মেয়েই আমার পুত্রবধূ হবে।'

'ভুল করছেন না তো ?'

'ভুল ! কাল রাতে আমি কী স্বপ্ন দেখেছি জানেন। কোজাগরী পূর্ণিমার রাত। আপনার মেয়ে মা লক্ষ্মীর বেশে, কোলে লক্ষ্মীর ঝাঁপি নিয়ে আমাদের বাড়ির উঠনে দাঁড়িয়ে। কী অপূর্ব তার রূপ ! যেখানে তার পা পড়ছে, সেই জায়গাটাই স্বর্ণময় হয়ে যাচ্ছে। ভোর হতেই গুরুদেবের কাছে ছুটলুম। তিনি বললেন, মা আসতে চাইছেন, আর দেরি নয়।'

'কি বলছেন আপনি ?'

'থেকে থেকে আপনি কি বলছেন, কি বলছেন করবেন না। বেয়ানকে ডাকুন। শাঁখ বাজান, শাঁখ বাজান। আজ বড় আনন্দের দিন।'

'আমি যে বড় গরিব!'

'সেইটাই তো আপনার সবচেয়ে বড় ঐশ্বর্য। সেই জন্যেই তো আপনি খাঁটি মানুষ। ধনী হলে আপনার মেয়ে হত আপস্টার্ট, আপনি হতেন দু'নম্বর কারবারি। পাঁজিটা একবার আনান না মশাই।'

সন্ধে সাতটা নাগাদ সব পাকা করে শিশিরবাবু উঠে যেতে না যেতেই জহরবাবু এলেন। ছফুট লম্বা। চোখে গোলড ফ্রেমের চশমা। পরনে ধবধবে ধুতি, পাঞ্জাবি। ধনী মানুষকে প্রসন্নবাবু ভয় পেতেন। তাঁরা সাধারণত অহঙ্কারী হন। বড় বড় কথা বলেন। পৃথিবীটাকে নিজেদের মধ্যেই ভাগাভাগি করে নেন। জহরবাবুকে দেখে তা মনে হল না। বিনীত, নিরহঙ্কার। চেয়ার টেনে বসলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন আছেন?'

'বয়েসের তুলনায় ভালই।'

'ভেরি গুড। রিটায়ার করার পর সাধারণত মানুষ বড় ভেঙে পড়ে। ছেলে কিছু বলেছে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আপত্তি নেই তো?'

'আজ্ঞে না।'

'আপনাকে আমরা মাসে হাজার করে দোবো। তার বেশি আপাতত সম্ভব হবে না।'

'হাজার!' প্রসন্নবাবু প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন।

'কেন কম হয়ে গেল ?'

'আজ্ঞে না, আমি ভাবতেই পারছি না।'

'দিন কতক পরে, ধরুন পুজোর সময়, আরও একটু বাড়াতে পারব। কাল থেকে তা হলে লেগে পড়ুন।'

'বেশ।'

'গাড়ি এসে আপনাকে তুলে নিয়ে যাবে। গাড়িই আবার ফিরিয়ে দিয়ে যাবে। এই বয়েসে আর বাসট্রাম ঠ্যাঙাতে হবে না।'

'আজ্ঞে।' প্রসন্নবাবুর সামনে সব কেমন যেন স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে। যে পৃথিবীর সঙ্গে এতকালের পরিচয় তার চেহারা তো এরকম নয়! জহরবাবু কাজের মানুষ, ব্যস্ত মানুষ। কথা পাকা করে উঠে চলে গেলেন। প্রসন্নবাবুর মনে হতে লাগল, সংসারের ওপর দিয়ে ফুর-ফুর করে বসন্তের দখিনা বাতাস বইছে। সাবেক কালের আলমারির মাথায় বসে কোকিল ডাকছে মিহি সুরে। এ সুখ এতকাল ছিল কোথায়!

রাতের আহারে বসেছেন। রুটি আর কুমড়োর ঘ্যাঁট। সামনে বসে স্ত্রী সুষমা। এক সময় সুন্দরীই ছিলেন। এখন সংসারের আঁচে পিতলের প্রতিমার মত ঝলসে গেছেন। মুখে রুটি ঠুসে প্রসন্ন বললেন,

'সবই তা হলে হল ?'

'ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন।'

'বড় দেরিতে, বুঝলে, বড় দেরিতে।'

'তা হোক, কথায় বলে, সব ভালো যার শেষ ভালো।'

'এখন হাজার দেবে বুঝলে! পুজো নাগাদ আর একটু বাড়বে। এবার থেকে কুমড়োর ঘ্যাঁটে তুমি একটু ছোলা দিও, আর নামাবার সময় এক চামচে ঘি দিয়ে সাঁতলে নিও। বেশ টেস্ট হবে।'

'তুমি কুমড়োয় ছোলার কথা ভাবছ, আমি ভাবছি খান ছয়েক করে ফুলকো লুচির কথা। হাজারে আমাদের দু'জনের বেশ ভালই চলে যাবে। রোজ একটু করে দুধ, এক টুকরো মাছ এ বয়েসে দরকার, বুঝলে?'

'আমি আবার একটু অন্য রকম ভাবছি। আর একটু দূর ভবিষ্যতের কথা। পঞ্চাননতলায় সিধুরা সেই বিশাল পুকুরটা বুজিয়ে প্লট প্লট করে বেচছে। পি. এফ আর গ্র্যাচুয়িটির টাকাটা থেকেই যাবে। মেয়েটাকে তো ওঁরা এমনিই নিয়ে চললেন! ওই টাকাটায় ছোটখাটো একটা একতলা বাড়ির কথা ভাবলে কেমন হয়! আমার অবর্তমানে তোমাকে দেখবে কে?'

'আঃ, তুমি ওসব অলুক্ষণে কথা বোলো না বাপু। কে আগে যাবে, তোমার জানা আছে?'

'বয়েসে তোমার চেয়ে অন্তত বছর দশেকের বড় আমি। গণিতের হিসেবে, চাকরির নিয়মে আমারই ডাক আসবে আগে। অফিসে ছাঁটাইয়ের সময় বলত, লাস্ট কাম ফার্স্ট সার্ভড, আর রিটায়ারের সময় বলত ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভড। যাক ওসব বাজে কথা। এতকাল আমরা যে খাওয়ায়

অভ্যস্ত সেটাকে আর পালটে দরকার নেই। শরীর ওই সুরেই বাঁধা হয়ে গেছে। বরং দেরিতে হলেও ভবিষ্যতের কথা ভাবা যাক। ধরো আমি যদি নব্বই বছর বাঁচি। হ্যাগা, একটু গুড় আছে নাকি? শেষ রুটিটা তা হলে···!'

'গুড় নেই গো, একটু চিনি নেবে? বোসো রস করে দিচ্ছি।'

'না না, চিনির অনেক দাম।'

'এখনও তুমি দামের কথা ভাবছ। সামনের মাস থেকে তো···।'

'এখনও সবই হাওয়ায় ভাসছে সুষমা, পৃথিবীকে আমি তেমন বিশ্বাস করতে পারি না। বড় বেশি নাটক এখানে। কাপে আর ঠোঁটের চুমুকে অনেক ফস্‌কাফস্‌কির ব্যাপার থাকে। দাও, আর এক গেলাস জল দাও। এখন কি আর আমাদের ভোগের বয়েস আছে, ত্যাগের বয়েস।'

হাতমুখ ধুয়ে প্রসন্নবাবু চৌকিতে বসে স্ত্রীকে বললেন, 'তুমি তা হলে কোমর বেঁধে লেগে পড়। শ্রাবণ আর মাত্র দু'মাস। মৌ কোথায়? শুয়ে পড়েছে?'

'শোবে কি গো! ও তোমার পাঞ্জাবির গলায় ভালি মারছে, কাল তো তোমার বেরনো! এ আর তোমার সেই সরকারী অফিস নয়, যে ছেঁড়া ট্যানা পরে যাবে। যাবে গাড়িতে, আসবে গাড়িতে। তুমি বাপু সবার আগে দু একটা ভালো ধুতি-পাঞ্জাবি করাও।'

'হ্যাঁ সে তো করাতেই হবে। অনেক দিনের শখ, তোমাকে দু'একটা ভালো শাড়ি পরাই, মেয়েটাকে একটু সাজাই।

মেয়ের ভাবনা অবশ্য আমাকে আর ভাবতে হচ্ছে না। জামাই বাবাজি ভাববে। আচ্ছা, আমি, তাহলে শুয়ে পড়ি কি বলো! আজ একটু বিশ্রাম নিই। অনেক দিন পরে, কাল থেকে আবার বেরনো। হ্যাঁগা, রোজ দাড়ি কামাতে হবে না কি?'

'তা হবে না! মার্চেণ্ট অফিসে চকচকে মুখ চাই।'

'তা হলে, তুমি বাপু আমাকে সকাল সকাল ডেকে দিও। কেমন? সব অভ্যাস প্রায় ভুলে এসেছি।'

ছোট্ট খাটটিতে প্রসন্নবাবু মশারির একটি পাশ তুলে ঢুকে পড়লেন। মহুয়া বড় হবার পর থেকেই স্বামী-স্ত্রীর শয্যা আলাদা হয়ে গেছে। প্রথম প্রথম এই একক ব্যবস্থায় বড় নিঃসঙ্গ বোধ করতেন। এখন সয়ে গেছে। কত কি ভাবতে ভাবতে এক সময় ঘুম এসে যায়। আজ মনে মনে ভাবলেন, বিছানা, বালিশ, মশারি সব কিছুর চেহারা এবার পালটে ফেলবেন। শয্যা মানুষের একটা বিলাস। অনেক বাড়িতে দেখেছেন, বিছানার কি কায়দা। ছোবড়ার গদি, ফুলো তোশক, বাহারি চাদর, সুন্দর বালিশ। দেখলেই মনে হয়, আঃ, বলে শুয়ে পড়ি।

বহুকালের তোশক। জায়গায়, জায়গায় তুলো সব গুটিয়ে পাকিয়ে ড্যালা ড্যালা হয়ে গেছে। দাম্পত্য জীবনের কত দুঃখের, কত সুখের স্মৃতি জমে আছে এই রঙ্গভূমির মত শয্যা-ভূমিতে। এখানে যৌবনের দিন ঝরে গিয়ে পড়ে আছে পত্রহীন শুষ্ক কঙ্কাল।

বালিশে মাথা রেখে আজ বেশ একটা সুখানুভূতি আসছে। ঘর অন্ধকার হলে আশপাশের আলো, শব্দ এসে ঢুকছে। বেশ লাগছে! এমন ভাল বহুদিন লাগেনি। প্রসন্ন? নিজেকেই নিজে ডাকলেন। এতদিনে তা হলে একটু সুখের মুখ দেখবে! শুকনো ডালে আবার দু'একটি সবুজ পাতা আসবে! শরীরে আসবে চেকনাই। যা যা ভোগ করা হয়নি, একে একে সব ভোগ করবো। মহুয়া শ্বশুর বাড়ি চলে গেলে, সুষমা আবার পাশে এসে শুতে পারবে!

'তোমার জল চাপা রইল।'

সুষমা জলের গেলাস রেখে চলে গেল। বাইরে মা আর মেয়ে কথা বলছে। কানে ভেসে ভেসে আসছে। বেশ একটা পূর্ণতার অনুভূতি আসছে। আঃ চোখের সামনে কত কি দৃশ্য ভেসে আসছে। বেনারসী পরে মহুয়া চলেছে শ্বশুরবাড়ি। হরিদ্বারে গঙ্গার ধারে বসে আছি, আমি আর সুষমা। পঞ্চানন-তলার জমিতে বাড়ির ভিত উঠছে। নাঃ তোশকটাকে ধুনিয়ে, নরম, সমতল একটা বিছানা তৈরি করাতেই হবে। তুলো ধোনা দেখতে বেশ মজা লাগে। টংটং করে টঙ্কারের শব্দ। তুলো উড়ছে ফুর্‌ফুর্‌ করে। জীবনের দুঃখ আর সুখ টঙ্কারের শব্দে উড়ছে, আবার এসে জমা হচ্ছে একই জায়গায়। পাঁজা পাঁজা তুলো।

বুকের বাঁ দিকে টং করে একটা শব্দ হল। মাথায় যেন বেজে উঠল স্কুল-ছুটির ঘণ্টা। সব যেন হই হই করে বেরিয়ে আসছে, ছুটি ছুটি। কানের কাছে জাহাজের ভোঁ বাজছে।

পাটাতনে নোঙর তোলার শব্দ। ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকার চেষ্টা করলেন, সুষমা, তুমি কোথায়? এ যে ভীষণ অন্ধকার! তুমি আমার হাতটা ধর। মহুয়া। ধুনুরির টঙ্কার চেতনাকে আচ্ছন্ন করে দিল। তুলো উড়ছে রাশি রাশি। আর কিছু মনে রইল না।

না থাকারই কথা। প্রসন্নবাবুর ছুটি হয়ে গেল। সুষমা তখনই কিছু জানতে পারল না। কাল যে মানুষটা বেরোবে, তার জন্যে পরিষ্কার ধুতি চাই, পাঞ্জাবি চাই, রুমাল চাই, একটা গেঞ্জি চাই, জুতোর চেহারাটা একটু ভাল না হলে চলে! নটার মধ্যে খেতে বসাতে হবে। সময়ে রান্নার অভ্যাস আবার ফিরিয়ে আনতে হবে। মা আর মেয়েতে যখন টুকি-টাকিতে ব্যস্ত, প্রসন্নবাবু তখন নিঃশব্দে চলে গেলেন। হৃদয়হীন হৃদয়ের কারসাজি।

সকালে মানুষটিকে নতুন কর্মস্থলে নিয়ে যাবার জন্যে গাড়ি এলো ঠিকই, তবে এ গাড়ি সে গাড়ি নয়। এ হল ছুটির পর ঘরে ফিরে যাবার গাড়ি। ফুলে ঢাকা প্রসন্ন সিদ্ধান্ত, যেদিকে যাবার কথা সেদিকে না গিয়ে বিপরীত দিকে চলে গেলেন।

পাখিরা চিরকালই কথা বলে। সেকালের মানুষ সে ভাষা বুঝত। একালের মানুষ বোঝে না। বুঝলে, শুনতে পেত, প্রসন্নবাবুর বাড়ির কারনিশে বসে দুটি পাখি নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে,

'লোকটি সুখ নিয়ে চলে গেল, দুঃখ নিয়ে আবার যেন ফিরে না আসে!'

অংশীদার

গণেশ আমার ব্যবসার পার্টনার, জ্যাঠামশাই তখন ঠিকই বলেছিলেন, দেখ জগন্নাথ, বেকার থাকা তবু মন্দের ভাল, কিন্তু পার্টনারশিপে ব্যবসা করতে যেও না, মরবে, বাঙালীর পার্টনারশিপ টেঁকে না। বাঙালীর স্বভাব অতি সাংঘাতিক, দুজন বাঙালী যদি নৌকা চেপে সমুদ্র পাড়ি দিতে যায়, তো একজন যখন ঘুমোবে আর একজন তখন নৌকোর তলা ফুটো করবে। ভরাডুবি হবে জেনেও এই কাজ করবে।

জ্যাঠামশাইয়ের কথা শুনিনি। না শুনে আমার আজ এই হাল। হেলেন অ্যাণ্ড এসবি কোম্পানির ফুটপাথে চোপসানো বেলুনের মত দাঁড়িয়ে আছি, হাতে সাত হাজার টাকার বিল, নাচতে নাচতে এলুম, টাকাটা আদায় হলে লিলিকে বলেছিলুম কাশ্মীরে গিয়ে ফুর্তি করব। অ্যাকাউন্টেন্ট বললেন, 'কতবার টাকা নেবেন মশাই? তিনদিন আগে আপনার পার্টনার এসে টাকা নিয়ে গেছে।'

'নিয়ে গেছে মানে? এই তো বিল আমার কাছে, টাকা আমার পার্টনারের কাছে? অলৌকিক ব্যাপার!'

'অলৌকিক-ফলৌকিক বুঝি না মশাই, এই দেখুন ফাইল, এই দেখুন আপনাদের কোম্পানির স্ট্যাম্প মারা রিসিটেড বিল, আমাদের চালান।'

চোখ ছানাবড়া, ফুটপাথে দাঁড়িয়ে উদাস মুখে সিগারেট খাচ্ছি। ট্রাম যাচ্ছে, বাস যাচ্ছে, লোকের স্রোত বইছে, হাই-হিল জুতো পরে মাথায় ফুলের ছাতা মেলে হেলেদুলে এক মেমসাহেব চলেছে, কোন কিছুই মনে ধরছে না। এই অবস্থায় আমাকে কেউ দেখলে বলত—জগন্নাথটা উল্লুকের মত দাঁড়িয়ে আছে।

'হারামজাদা!'

পাশ দিয়ে চাপ চাপ দাড়িওলা একটা গুণ্ডামত লোক যাচ্ছিল, ততটা খেয়াল করিনি। লোকটি ঝপাত করে থেমে পড়ল, 'আমাকে বললেন?'

'আজ্ঞে না, আপনাকে এসব বলব কেন?' মনে মনে খুব ভয় পেয়ে গেছি।

'তবে কাকে বললেন?'

'আজ্ঞে, আমার পার্টনার গণেশকে।'

'কেন? উল্টে গেছে?'

'আজ্ঞে না, নিজে সোজা আছে, আমাকে উল্টে দিয়েছে।'

'সিগারেট আছে?' লোকটি একটা সিগারেট চাইল,

সিগারেট আর নস্যি একা ভোগ করার উপায় নেই। ভাগীদার জুটবেই। সিগারেট ধরিয়ে লোকটি বললে, 'শালা!'

'কে, আমি?'

'না, না, আপনি কেন শালা হতে যাবেন? আমার রিয়েল শালা, বউয়ের ভাই পঞ্চানন।'

'শালা তো শালা হবেই।' স্বস্তির গলায় বললুম।

'আরে না মশাই না, এ শালা হল সেই শালা।' ভীষণ রেগে গেছে লোকটি। এক টানে সিগারেটের আধখানাই পড়পড় করে পুড়ে গেল। 'মানে, সেই ইতর শালা?'

'ইতর! চামার শালা।'

'কি করেছেন পঞ্চাননবাবু?' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলুম।

'আর বাবু বলে সম্মান করতে হবে না। বলুন, পঞ্চাশালা।'

'আপনার শ্যালক হলেও, আমার তো নয়, কি করে বলি বলুন?'

'আরে মশাই, ও হল সব শালার শালা।'

'কি করেছেন তিনি?'

'তিনি আমার স্ত্রীর নেকলেস নিয়ে হাওয়া মেরেছেন।'

'ছিনতাই?'

'না, না, ছিনতাই নয়, চোরের ওপর বাটপাড়ি, নেকলেসটা হাত সাফাই করে ওর হাতে দিয়েছিলুম ঝেড়ে দেবার জন্যে, পৃথিবীটা শালা পাল্টে গেছে। কারোর মধ্যে এতটুকু সততা

নেই, অনেস্টি নেই। বিশ্বাসের দাম দিতে জানে না। বিশ্বাস-ঘাতকের দল।'

'স্ত্রীর গয়না হাতসাফাই করাটা খুব ভাল কাজ নয় ইয়েবাবু।'

'ইয়েবাবু নয়, পলটুবাবু।'

'হ্যাঁ পলটুবাবু। ওটা খুব নোংরা কাজ, নীচ কাজ।'

'আপনাকে আর জ্ঞান দিতে হবে না! কি বাবু?'

'জগন্নাথবাবু।'

'হ্যাঁ, জগন্নাথবাবু। ওসব জ্ঞানের কথা প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগেই মানায়।'

'স্ত্রীলোকে গয়না পায় স্বামীর দৌলতে। আমি আমার বউকে বিয়ে করেছিলুম বলেই আমার শ্বশুরমশাই ধার-দেনা করে দশভরি গয়না দিয়েছিলেন। বিয়ে না করলে মেয়েকে গয়না দিতেন! গবেট।'

'কে গবেট?'

'আপনি, আবার কে। যাক, আলাপ যখন হয়েই গেল, তখন চলুন কোথাও বসে চা খাওয়া যাক। আগেই বলে রাখছি, তিনটের পর আমি শুধু চা খেতে পারব না। মোগলাই-টোগলাই চাই। পকেটে সে রকম মালকড়ি আছে তো!'

বেশ মজার লোক, নিজের দুঃখে এতক্ষণ খুব কাবু কাবু লাগছিল। এই লোকটিকে পেয়ে বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। দুঃখ ভাগ করে নিতে পারলে, সেই প্রবাদের মত, একের বোঝা দশের লাঠি।

কাঠের কেবিন। ঘ্যানঘ্যান করে একটা কেবিন-ফ্যান ঘুরছে। চারটে পায়া থাকলেই যদি টেবিল হয়, তা হলে সেই রকম একটা টেবিলের দু-পাশে দুটো চেয়ার। চটচটে একটা মরিচ আর একটা নুনদানি। আবার একটা পর্দাও ঝুলছে। মেয়েছেলে ফেয়েছেলে নিয়ে কেউ এলে, ওই ময়লা ময়লা পর্দাটা ঝড়াং করে টেনে দিলেই আড়াল তৈরি হবে। পাশের কেবিনটায় পর্দা টানা রয়েছে। মাঝে মাঝে চুড়ির কিনিকিনি শোনা যাচ্ছে।

বয় এসে দাঁড়াতেই আমাকে আর অর্ডার দিতে হল না। পলটুবাবুই হুকুম জারি করলেন, দুটো মোগলাই, একটায় ডবল ডিম আর মাংসের কিমা, বেশি পেঁয়াজ আর আদা-কুচি। বয় চলে গেল। পলটুবাবু বললেন, 'আপনারটা লাইটই থাক। বলা যায় না, পেটে সহ্য হবে কি? হবে না।'

পলটুবাবু গেলাসে চুমুক দিলেন। অল্প একটু জল খেয়ে বললেন, 'চোখের সামনে দিয়ে সিলভার অ্যারো বেরিয়ে গেল, কিছু করতে পারলুম না। ইস, ইস। শালা আমাকে হেল্পলেস করে দিলে।'

'সিলভার অ্যারো? সেটা আবার কি?'

'আরে ঘোড়া মশাই, ঘোড়া। ব্যাঙ্গালোর রেসে শনিবার দৌড়চ্ছে। ভেবেছিলুম, ট্রিপলটোটে খেলে একটা নেকলেস দুটো করে আনব। শালা পথ মেরে দিলে। সেই বউই ভাল, যে বউতে শালা নেই।'

'আপনি রেস খেলেন ? রেসে মানুষ সর্বস্বান্ত হয়।'

'তা হয়। আমিও হয়েছি। তবে জেদ চেপে গেছে। ঘোড়ার লাগাম আমি ধরবই। করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে। কি অমন জন্তু মশাই! মেয়েছেলে নাকি ? সারা জীবন ছলনা করে যাবে। মানুষ বলবে, দেবা না জানন্তি কুতো মনুষ্যা, ওই তো চারটে পা, একটা ল্যাজ, পিঠে একটা জকি। কতকাল ছলনা করবে ? আমি শেষ রাতে স্বপ্ন পেয়েছি—সিলভার অ্যারো, সিলভার অ্যারো।'

মোগলাই এসে গেল। পলটুবাবু ছুরি কাঁটা নিয়ে ডিসের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। একটা বড় মাপের টুকরো মুখে পুরে বললেন, 'আজ থেকে আপনি আমার বন্ধু, বিপদে আপদে, আপনার কেসটা কি ?'

'আমার কেস, ওই বাঙালীর পার্টনারশিপ, একটা ব্যবসা করেছিলুম। গণেশ আমার ওয়ার্কিং পার্টনার। বেটা খুব বেগোড়বাঁই করছে। টাকা-ফাকা সরাচ্ছে। কিছু বলতে গেলেই চোখ রাঙায়। ভয় দেখায়। মহা ফাঁপরে পড়ে গেছি।'

'মালটাকে হাটান না, হাপিস করে দিন।'

'হাপিস মানে ?'

'গুম করে দিন। লোকটা ছিল, লোকটা আর নেই।'

'মার্ডার ?'

'মার্ডার-ফার্ডার জানি না, মাল লোপাট।'

'কিভাবে ?'

'ও অনেক রাস্তা আছে, আমার গুরু জানে।'

'রেসের গুরু ?'

পলটুবাবু ছুরি দিয়ে প্লেটের গায়ে ট্যাং ট্যাং করে শব্দ করলেন, বয় এসে দাঁড়াল।

'পেঁয়াজ আনো।'

বয় চলে যেতেই পলটুবাবু বললেন, 'গুরু আমার নাম্বার ওয়ান, আইন জানে, ক্যারাটে, কুংফু জানে, ভাল ডাক্তারের মত ছুরি চালাতে জানে। কি রকম চোট দিয়েছে ?'

'এই মাত্র সাত হাজার।'

'সাত হাজার ? কোন মানে হয়! সাতবার একুশটা ঘোড়া ছোটানো যেত! মালটাকে জোটালেন কোত্থেকে ?'

'জুটে গেল! এখন আর নামতে চাইছে না। ব্যবসা থেকে আমাকেই আউট করে দেবে দেখছি। কোর্ট-কাছারি কে করবে ? আইন দিয়ে হাঁটাতে গেলে অনেক টাকার ধাক্কা, কারবার লাটে উঠে যাবে।'

পলটুবাবু চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, 'কোর্ট-কাছারি ছাড়াও অন্য রাস্তা আছে। ধোলাই।'

'কে ধোলাই দেবে ? আমার ক্ষমতা নেই।'

'কাপড় ধোলাই করার যেমন লোক আছে, মানুষ ধোলাই করারও তেমনি লোক আছে।'

'তাতে তো আর টাকা ফিরবে না, জোচ্চুরিও বন্ধ হবে না।'

'তাহলে মালকে পগার পার করে দিতে হবে।'

'মার্ডার?'

'মার্ডার আবার কি? আজকাল মার্ডার বলে কিছু নেই, যাকে পার ধর আর মার।'

'না মশাই, ওসব ঝামেলার মধ্যে আমি নেই, সাত হাজার গেছে, আরও হয়তো যাবে। যায় যাক।'

'যায় যাক বলে কোনও শব্দ আমার ডিকশেনারিতে নেই। ইউ আর মাই ফ্রেণ্ড। গণেশের পেট আমি ফাঁসাবই, ছুরি দিয়ে নয়, দৈব দিয়ে।'

'মাদুলি ফাদুলি?'

'বাণ মেরে, বাণ মেরে শুকিয়ে দেব, দিন দিন মরা কাঠের মত চেহারা হয়ে যাবে।'

'ধ্যাস, ওসবে আমার বিশ্বাস নেই!'

'বিশ্বাস নেই?' পলটুবাবু দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে উঠলেন, 'হিন্দুর ছেলে ঝাড়ফুঁকে বিশ্বাস নেই। কি আমার সায়েব রে!'

'নেই তা কি করব?'

'এখুনি বিশ্বাস হবে। এমন এক জায়গায় নিয়ে যাব, আপনি তো তুচ্ছ, আপনার বাবারও বিশ্বাস হবে।'

রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে এসে আবার আমরা রাস্তায়। অফিস ভাঙা ভিড় বাসে ট্রামে। পলটুবাবু বললেন, 'একটা সিগারেট ছাড়ুন। খুব খাইয়েছেন মশাই। পৃথিবীতে সাধুও

যেমন আছে, শয়তানও তেমনি আছে! মিলেমিশে এই জগৎ। আপনার মনটা বেশ ভালই।'

সিগারেট ধরিয়ে ভুস করে খানিকটা ধোঁয়া ছাড়লেন।

'নিন, চলুন। শত্রুর শেষ রাখতে নেই। দু'শালাকেই যমের বাড়ি পাঠাব। পঞ্চা আর গণশা। নেকলেস, আর সাত হাজার। হজম করতে দেব না।'

'কোথায় যাবেন?'

'সিরিটি।'

'সেটা আবার কোথায়?'

'কাছেই। বাসে ঘণ্টা দেড়েক লাগবে।'

'সিরিটি যাব কেন?'

'সেখানে আমার গুরুর আশ্রম। মহাশ্মশানের পাশে। তান্ত্রিক মন্ত্র পড়ে একটা জবাফুল মাটিতে ফেলে দেবেন, আকাশ থেকে হুড়মুড় করে প্লেন ভেঙে পড়বে, ব্রীজ থেকে ট্রেন ঝাঁপিয়ে পড়বে জলে, শোবার ঘরে খাটের তলায় দপ করে আগুন লাফিয়ে উঠবে, সিলিং থেকে ফ্যান খসে পড়বে মাথার ওপর। আলমারির তলা থেকে সাপ বেরোবে ফোঁস করে।

যখন যেখানে যা দরকার, ঠিক তাই ঘটে যাবে। চলুন, চলুন, আর দেরি না।'

গণেশের ওপর আমার ভীষণ রাগ হচ্ছিল। ফ্যা ফ্যা করে ঘুরছিল। ধরে এনে ব্যবসায় ভেড়ালুম। তিন বছর না যেতেই বিয়ে করে বসল। বাঙালীর ছেলে বিয়ে করে সায়েবদের

মত হনিমুনে গেল কুলু, মানালি, কত কি, তখন কি জানতুম ছাই, আমারই ট্যাঙ্ক ফুটো করে বাবুর থপচপানি। আদুরে বউকে নিয়ে দেড় মাস আদিখ্যেতা। দেখাই যাক না, কি হয়। গণেশকে একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার। তা না হলে সারা জীবন জোচ্চুরি করে যাবে। আজ আমার সঙ্গে, কাল রামের সঙ্গে, পরশু হরির সঙ্গে।

ভাবতে ভাবতেই বাস এসে পড়ল। পলটু 'উঠুন' বলে ঠেলেঠুলে উঠিয়ে দিলেন।

সিরিটি জায়গাটা আদি গঙ্গার ধারে। কলকাতার এত কাছে এমন একটা অদ্ভুত জায়গা আছে, আমার জানাই ছিল না। পলটুবাবুর গুরুদেবের আশ্রম একেবারে নদীর ধারে। ঢালু জমি আশ্রমের পেছন দিকে গড়িয়ে নেমে গেছে মজা নদীর দিকে। সেখানেই শ্মশান। আধপোড়া মৃতদেহ এখানে-সেখানে ছড়িয়ে আছে। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। গোটাকতক শেয়াল সেই বীভৎস জায়গায় খ্যা খ্যা করছে। কালো কালো কুকুর ঘুরছে। জ্বলজ্বলে চোখ। চারপাশে পচা গন্ধ। বিশাল একটা বটগাছ। তলাটা অন্ধকার। বাঁধানো বেদি। মাঝে মাঝে কাসপেঁচা ডেকে উঠছে। একটা দুটো করে বাদুড় ডাল থেকে খসে পড়ে সুইস সুইস শব্দে আকাশের দিকে উড়ে চলেছে। সমস্ত দৃশ্যটাই যেন একটা দুঃস্বপ্নের মত।

একটা একতলা কোঠাবাড়ি। বাইরে থেকে দেখলে আশ্রম বলে মনে হবার কথা নয়। সামনেই উঁচু রোয়াক, পথ

পাশ দিয়ে ঘুরে গা ছমছম করা বটতলায় অন্ধকার পেরিয়ে পেছনে আদিগঙ্গার ঢালে গিয়ে পড়েছে। বটতলায় দাঁড়িয়ে আছেন মা ছিন্নমস্তা। দেখলেই বুক কেঁপে ওঠে। এক হাতে নিজের মুণ্ডু, কাটা গলা দিয়ে ফোয়ারার মত রক্ত উঠে মুখে ঢুকছে। নিজের রক্ত মা নিজেই পান করছেন।

পলটুবাবুর সঙ্গে পেছনের দরজা দিয়ে বাড়িতে ঢুকতে হল। ভেতরে উঠোন। উঠোন ঘিরে উঁচু দালান। টকটকে লাল রঙের মেঝে। সারি সারি বড় ছোট ঘর। একটি মেয়ে এঘর থেকে ওঘরে যাচ্ছিল। শ্যামবর্ণা, কিন্তু ভারি মিষ্টি চেহারা। আমাদের দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বললে, 'উনি এখন বিশ্রাম করছেন একটু। আজ অমাবস্যা, সারারাত পুজো আছে তো?'

পলটুবাবু বললেন, 'তা থাক, আমাদের খুব জরুরি দরকার। বেশি দেরি করলে, গুরুজীর পাওয়ারের বাইরে চলে যাবে। গুরুজী গুরুজী, আমরা এসে গেছি।'

পলটুবাবুর দাপট কম নয়, গটগট করে দালান পেরিয়ে ঘরে ঢুকলো।. আমাকে ইতস্তত করতে দেখে বললেন, 'চলে আসুন না, ভয় পাচ্ছেন কেন?'

প্রথম যে ঘরটা, সেটা বোধহয় ঠাকুরঘর। বেশ বড়। ধূপধুনো ফুল বেলপাতা সব মিলেমিশে কেমন একটা গন্ধ তৈরি হয়েছে। একপাশে উঁচু বেদিতে তারা-মূর্তি। বিশাল একটা প্রদীপ জ্বলছে থিরথির করে, সামনে আসন পাতা। চারপাশে ছড়ানো পূজার জিনিস।

ঘর পেরিয়ে ঘর।

'গুরুজী! গুরুজী!'

ভেতর থেকে ভেসে এল গম্ভীর গলা, 'অসময়ে কেন?'

'বিপদে পড়ে গেছি গুরুজী।'

লাল টকটকে চেলি পরে গৌরবর্ণ এক বৃদ্ধ একটি খাটে শুয়ে আছেন। খোলা গা। লাল পৈতে। মুখটি বেশ প্রসন্ন ও উজ্জ্বল। 'তোর তো পদে পদেই বিপদ। সঙ্গে আবার কাকে নিয়ে এলি?'

'আমার এক বন্ধু। দুজনেই বিপদে পড়েছি।'

'কি বিপদ?'

মেঝেতে দুজনে বসে পড়লুম। পলটুবাবুই সব বললেন। নেকলেস হাতিয়ে শ্যালক বেপাত্তা। সাত হাজার মেরে আমার পার্টনার হাওয়া।

গুরুজী সব শুনে বললেন, 'আমার কি করার আছে? আমি আমার সাধনভজন নিয়ে একপাশে পড়ে আছি। তোদের এসব ছেঁচড়া ব্যাপারে আমি কি করব?'

'গুরুজী, সেবার আপনি জগাইকে সাত মাস হাসপাতালে ফেলে রেখেছিলেন।'

'কোন জগাই?'

'ওই যে আমার জ্যাঠামশাইয়ের ছেলে। আমাকে একদিন ধরে খুব ধোলাই দিয়েছিল।'

'বারবার ওসব কাজ হয় না রে পলটু। তাছাড়া এই

কিছুদিন আগে আমি একটা বড় কাজ করেছি। এখন কিছুদিন বিশ্রাম চাই।'

'কি বড় কাজ গুরুজী?'

'একটা বিমান দুর্ঘটনা আর একটা ট্রেন দুর্ঘটনা। আমার বহুত শক্তি ক্ষয় হয়ে গেছে। এখন মাসতিনেক আমাকে ক্রিয়াকলাপ করতে হবে।'

'ও দুটো কাজ কেন করলেন গুরুজী?'

'প্রয়োজন ছিল।'

পলটু ঘষটে ঘষটে গুরুজীর খাটের দিকে এগিয়ে গিয়ে পা'দুটো জড়িয়ে ধরল, 'সামান্য কাজ গুরুজী। এ তো আপনার কাছে ছুঁচো মারা।'

'একটা নেকলেস আর সাত হাজার টাকার জন্যে জ্বলজ্যান্ত দুটো লোককে মেরে ফেলবে? শুয়োর।'

'পাপের শাস্তি গুরুজী। গীতাতেই তো আছে। বিনাশায় চ দুষ্কৃতকারিণাং।'

'তোরা কি এমন সুকৃতি করেছিস?'

'আমি না হয় বদ গুরুজী, কিন্তু আমার বন্ধু! পার্টনার মেরে ফাঁক করে দিচ্ছে।'

'তাতে তোর কি রে শালা?'

'পরের দুঃখে আমার মন যে কাঁদে।'

'আহা! আমার শ্রীচৈতন্য রে!'

পলটুবাবু একেবারে নাছোড়বান্দা। পা ধরে ঝুলোঝুলি।

আমি একবার ফিসফিস করে বললুম, 'ছেড়ে দিন না মশাই। যা হবার তা হবে। নিজের! বোকা বনেছি, বোকাই থাকি। পরের অনিষ্ট করে কার কি লাভ হবে?'

'কি যে বলেন। অন্যায় যে সহে, অন্যায় যে করে তব ঘৃণা তারে যেন .... '

'সে তো ঈশ্বরের ঘৃণা?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, সেই ঘৃণা, সেই শাস্তিই তো গুরুদেব নামিয়ে আনবেন।'

গুরুজী এতক্ষণ শুয়ে শুয়েই কথা বলছিলেন। এইবার ধীরে ধীরে উঠে বসলেন। পা দুটো খাট থেকে নেমে এসে ঝুলতে লাগল ড্যাং ড্যাং করে। বেশ গোলগাল বেঁটেখাটো চেহারা। গুরুজী হঠাৎ ডাকতে শুরু করলেন, 'মায়া-মায়া!'

সেই মেয়েটি ঘরে এল। আমাব এখনও বিয়ে হয়নি। বিয়ে হলে হয়ে যেত। বউকে খাওয়াবার মত পয়সাকড়ির অভাবে আইবুড়ো কার্তিক হয়ে বসে আছি। এই তো সবে লিলি বলে একটা মেয়েকে নাড়াচাড়া করে দেখছি। কিন্তু এই মেয়েটিকে দেখার পর থেকে লিলি বাতিল।

গুরুজী বললেন, 'একটা বড় বাটি করে একবাটি জল আনত মা।' মায়া চলে গেল। আমার চোখও পেছন পেছন চলল। নাঃ, গুরুর চেলা বনে বাকি জীবনটা পদসেবা করেই কাটিয়ে দিই।

মায়া আবার এল। চেটাল একটি কাঁসিতে টলটলে জল।

মেঝেতে গুরুজীর পায়ের কাছে সামনে ঝুঁকে পড়ে নামিয়ে রাখল। সেই সময় কিছু কিছু জিনিস দেখে আমি প্রায় মরে যাবার মত হলুম। শরীর নয় তো, মরণ-ফাঁদ।

গুরুজী সেই জলের দিকে একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, 'পলটু, তোমার নেকলেস তোমার বাড়িতেই আছে, তোমার বউয়ের কাছে। আর তোমার? কি নাম তোমার?'

'জগন্নাথ।'

'জগন্নাথ। বেশ। তোমার সাঙাতকেও আমি আমার জল দর্পণে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। মুখটা গোল। নাক থেবড়া। চোখ দুটো মার্বলের মত। জোড়া ভুরু। ডান ঠোঁটের ওপব কাটা দাগ। কি মিলছে?'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ। ঠিক ঠিক মিলছে।'

'মিলতেই হবে। কি নাম বলেছিলে?'

'গণেশ।'

গুরুজী স্তব্ধ হয়ে চোখ বড় বড় করে জলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কি আশ্চর্য! আমরা কিন্তু কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। গুরুজীর চমক ভাঙল। 'ছ' থেকে সাত মাসের মধ্যে গণেশের ফাঁসি হবে।'

কথা ক'টা বলেই খুব ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়লেন, 'তারা, তারা, তোরা এখন যা। যাবার আগে মাকে প্রণাম করে যা।'

ঠাকুরঘরে মায়া হাঁটু মুড়ে বসে পুজোর ফুল গুছিয়ে রাখছে। মনে মনে বললুম, আমার যদি একটা সংসার থাকত। এইরকম

একটা শ্যামলী বউ! লিলি? যেমন নাম তেমন ছিরি। হাণ্টার-ওয়ালী, ববচুল। ঠোঁটে লাল রঙ, মুখে মেকআপ, কটাসুন্দরী!

টেলিফোন বেজেই চলছে। কেউ ধরে না কেন? বাড়িশুদ্ধ সব একসঙ্গে সুইসাইড করেছে নাকি? অবশেষে কেউ একজন ধরেছে।

মেয়েলি গলা।

'হ্যালো।'

'গণেশ আছে?'

'কে আপনি?'

'আমি যেই হই না, গণেশ আছে কি নেই!'

'নেই, কলকাতার বাইরে গেছে।'

'অত পাঁয়তাড়া না করে এই কথাটাই তো আগে বললে হত।'

ফোনটা দুম করে নামিয়ে রাখলুম। বেটা কলকাতাতেই আছে। পালিয়ে বেড়াচ্ছে। কেস ঠোকার আগে মুখোমুখি একবার কথা বলতে চাই। এখন ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলে ভাল। নয়তো উকিলে খাবে হকের পয়সা। আমি নিজেই একবার যাব। আজই যাব, ওকে না পাই ওর বউকে বলে আসব।

ট্রাম থেকে নামতেই টিপটিপ করে বৃষ্টি এল। ট্রাম রাস্তা ছেড়ে বাঁয়ে মোড় নিলুম। রাস্তাটা নেহাত কম চওড়া নয়। দু'পাশে খাড়া খাড়া বাড়ি। দু'একটা বাড়ির সঙ্গে লাগোয়া বাগান। এমন কিচ্ছু জোর বৃষ্টি নয়। পিটির পিটির, সময়টা

দুপুর-দুপুর, রাস্তা তাই নির্জন। পেছনে একটা মোটর সাইকেল আসছে ঝড়ের বেগে। ওই শব্দটাকে আমি ভীষণ ভয় পাই। ছেলেবেলার আতঙ্ক আর কি! একবার ধাক্কা খেয়েছিলুম। যতটা সম্ভব রাস্তার বাঁ ধারে সরে গেছি। ভীষণ শব্দ ক্রমশই এগিয়ে আসছে। একে নির্জন রাস্তা, তার ওপর দুপাশে খাড়া খাড়া বাড়ি। শব্দটা সেই কারণেই আরও জোর মনে হচ্ছে।

সত্যিই আমি প্রস্তুত ছিলুম না। কি ঘটছে, বোঝার আগেই ছিটকে রাস্তার ধারে গিয়ে পড়লুম। মোটর সাইকেলটা বাঁ দিক থেকে ডান দিকে সোজা হয়ে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল। কোমরে ভীষণ লেগেছে। পড়বার সময় বাঁ দিকে লাট খেয়েছিলুম, বাঁ হাতটা মনে হয় ভেঙেই গেছে। হাঁটু দুটো অক্ষত নেই। কপালটাও কেটেছে নিশ্চয়। আচ্ছা জানোয়ার তো! কোনও রকমে উঠে বসতে পেরেছি। উঠে দাঁড়াতে পারব কি! সামনের বাড়ির দোতলার জানালায় একটি মহিলার মুখ। কি লজ্জার কথা! মেয়েদের সামনে বেইজ্জত। উঠে আমাকে দাঁড়াতেই হবে। বাড়িটার দেয়াল ধরে কোনও রকমে উঠে দাঁড়ালুম। পা কাঁপছে, মাথা ঘুরছে। কোমর সোজা হচ্ছে না। উল্টো দিকেই একটা লাল রক। একটু বসতে পারলে ভাল হত! আবার যেন মোটর সাইকেলের আওয়াজ আসছে কানে। সর্বনাশ! আবার ফিরে আসছে নাকি? খুব দ্রুত আসছে। এবার মারলে আর বাঁচব না। বাঁচার একমাত্র রাস্তা কোনও রকমে রকে গিয়ে ওঠা। ঝড়ের

বেগে যমদূত এগিয়ে আসছে। ওই তো রক, না আর হল না। শূন্যে উড়ে গেলুম যেন! শরীরের সমস্ত হাড়গোড় খুলে গেল। মোটর সাইকেলের তীব্র শব্দ। কোথাও সশব্দে জানালা বন্ধ হল। মেয়েলি চিৎকার।

একটা শিশি ঝুলছে। স্বচ্ছ একটা নল হাতে এসে ঢুকছে। নাকে আর একটা নল। শরীরটা সীসের মত ভারী, কে যেন বললেন, 'জ্ঞান ফিরেছে, জ্ঞান ফিরেছে।'

খুটখুট জুতোর শব্দ। চোখে ঝাপসা দেখলেও দেখতে পাচ্ছি, একটা মুখ, মাথায় সাদা টুপি, সাদা অ্যাপ্রন, নীল পাড় শাড়ি। তিনটি মাত্র শব্দ আমি উচ্চারণ করতে পারলুম। মার্ডার, পুলিশ, গণেশ। তারপর আমি কিরকম এক আলোর স্রোতে ভেসে গেলুম। যেতে যেতে দেখলুম, একটা ফাঁসিকাঠ। গোল দড়ির ফাঁস, গণেশ। একপাশে গুরুজী লাল চেলি পরে, আর একপাশে আমি। আমার হাতে পুলিশের ব্যাটমের মত গোল করে পাকানো, শীল অ্যাণ্ড সরকার কোম্পানির পার্টনারশিপ ডিড।

এইসব কথা আমি কি করে লিখলুম জানি না। আমি যদি লিখে থাকি, তাহলে আমি মরিনি। কারণ মরা মানুষ আর যাই পারুক, লিখতে পারে না। আর আমি না মরলে, গণেশের ফাঁসি হয় না। ফাঁসি না হলে, দৈব মিথ্যে হয়ে যায়। তাহলে কি যে হয়েছে, কে জানে!

কারণ

বাজারে ঢুকেই দেখি সদানন্দববু। হাতে একটা চটের ব্যাগ, যার একটা হাতল নেই, একদিকে হেলে আছে। চোখে একটা রঙচটা চশমা। এই সাত সকালেই সারা মুখে একটা খুঁতখুঁতে ভাব লেপ্টে আছে। ভোরের বাজার। সবে বেপারীরা মালপত্র সাজিয়ে বসা শুরু করেছে। তেমন ভিড় নেই। সদানন্দবাবুকে দেখলেই আমার একটি মাত্র প্রশ্ন, কি কিছু হল ? এই একটা প্রশ্ন অনেক কিছু কভার করে।

কিছু হল! মানে অনেক কিছু। যেমন সদানন্দবাবুর দুই ছেলে পাশ-টাশ করে অনেকদিন বসে আছে। তাদের চাকরির কিছু ব্যবস্থা হল কিনা ? বড় জামাইয়ের ফ্যাক্টরিতে লক-আউট চলছে তার কি হল ? মেজ মেয়েকে সেদিন পাত্র-পক্ষ দেখে গেছে, পছন্দ হল কিনা ? ছোট খোকা ফুটবল খেলতে গিয়ে অণ্ডকোষ ফুলিয়ে এসেছে, হোমিওপ্যাথি হচ্ছিল, তার কি হল। সদানন্দবাবুর এক্‌সটেনসান হল কিনা! স্ত্রী জনডিসে ভুগছিলেন, মালা পরেছিলেন, সেই মালা পরার পর

জনডিস কমেছে কি না? সদানন্দবাবু নিজে ভীষণ কন্‌সটিপেশান আর অর্শে কষ্ট পাচ্ছিলেন, ইসবগুলের ভুষি খেয়ে কিছু ফল পেলেন কিনা? বাড়ির নিচে একঘর ভাড়াটে, বছরখানেক ভাড়া বন্ধ রেখেছে, সেই ঝামেলার কিছু হল কিনা? আমার এক প্রশ্নের ঢিলে অনেক পাখি মারার চেষ্টা।

সদানন্দবাবু একটু মুচকি হাসলেন। সেই হাসিতেই সব প্রশ্নের জবাব লুকিয়ে আছে। অর্থাৎ কিছুই হয়নি। যা ছিল সব একই রকম আছে। মুচকি হেসে সদানন্দবাবু পকেট থেকে একটা ছোট নস্যির ডিবে বের করে তালে তালে বার কতক টুসকি মারলেন তারপর ঢাকনা খুলে মাঝারী ধরনের এক টিপ নস্যি নিয়ে বেশ জোরে সশব্দে নাকে টানলেন। আমার দিকে ডিবেটা এগিয়ে দিতে গিয়ে কি ভেবে হাফ-হাতা সাদা লংক্লথের জামার পাশপকেটে ফেলে দিয়ে বললেন, 'নস্যি বা সিগারেট আগের মত কাউকে অফার করতে পারছি না।' আমি বললুম, 'না-না নস্যি আমি নি না, সিগারেটও খাই না, বদ অভ্যাসের মধ্যে চা-টাই আছে।'

'ওঃ খুব বেঁচে গেছেন, অনেক পয়সা মশাই সেভিংস হয়। আমার দেখুন সারাদিনে এই ছোট এক ডিবে বরাদ্দ আর এক প্যাকেট সিগারেট।'

'আপনার এই থলের হাতলটা মেরামত করিয়ে নেননি কেন?'

'এটাও ব্যয় সঙ্কোচের একটা কৌশল!'

'কি রকম ?'

'ইচ্ছে থাকলেও বেশি বাজার করতে পারব না। এক দিকটা হেলে যাবে। আমরা হলুম সেকালের মানুষ। খেয়েই ফতুর। টেরিলিন-মেরিলিন বুঝি না। শ্যাম্পু সাবান, টনিক-মনিক আমাদের কালে ছিল না। সেই অভ্যাসটা রয়ে গেছে। এই ব্যাগের মেরামতিটা গিন্নির মাথা থেকে বেরিয়েছে। একখানা মাথা মশাই।'

কথা বলতে বলতে বেপারীর ঝাঁকা থেকে সদানন্দবাবু একটা বেশ বড় পটল তুলে নিয়ে দর জিজ্ঞেস করলেন। দু'টাকা কিলো। হাত থেকে পটল পড়ে গেল। সে কি মশাই! কালও যে দেড় টাকা ছিল, সদানন্দবাবু বিস্ময়মাখা মুখে আমার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন, পটলের গায়ে একটা আঙুল আলতো করে ছুঁইয়ে রাখলেন।

আমি কি বলব ? বেপারীকেই বারকতক প্রশ্ন করলুম। তার উত্তর দেবার সময় কোথায়! সে তখন নানারকম তরিতরকারি সাজাতে ব্যস্ত। আমরা হলুম বাজারের মধ্যে নিতান্তই হাঘরে খদ্দের। আমরা ভেগে গেলেই সে খুশী হয়। বার বার বিরক্ত করায় সে উত্তর দিতে বাধ্য হল, বললে, 'জানেন না ভোরবেলা বৃষ্টি হল।' উত্তর শুনে সদানন্দবাবুর মুখের শক্ত ভাব নরম হয়ে হাসিতে ছেয়ে গেল, 'তাই বল!' সদানন্দবাবু টপাটপ পাল্লায় পটল তুলে ফেললেন। এইবার আমার অবাক হবার পালা। সদানন্দবাবু বললেন, 'দাম তো বাড়বেই,

বেড়েই চলবে, তার জন্যে কেনা তো আর বন্ধ করা যায় না ; কিন্তু কারণটা জানতে না পারলে মনটা খুঁতখুঁত করে। আজকে তাড়াতাড়ি পটলের দাম কিলোতে পঞ্চাশ পয়সা বাড়ার কারণটা যেই জানতে পারলুম আমি খুশী হয়ে গেলুম। বিনা কারণে কিছু হয়ে যাবে সে আপনি-আমি কেউই সহ্য করব না।'

সদানন্দবাবু পটলের পাল্লায় আমাকে ফেলে মাছের বাজারের দিকে চলে গেলেন।

বাড়ি ফিরে দ্বিতীয় কাপ চা খেতে খেতে মনে হল সদানন্দবাবু ঠিকই বলেছেন, জীবনের সবচেয়ে বড় খোঁজা হল ঈশ্বর নয়, মোক্ষ নয়, অর্থ নয়, কারণ। কারণ শব্দটা বিবিধ-ভারতীর বিজ্ঞাপনের কায়দায় ধ্বনি-প্রতিধ্বনি হয়ে সারা ঘরে ছড়িয়ে গেল—কারণ, কারণ, কারণ। কারণটাই হল সব জানার বড় জানা। পাখার দিকে তাকিয়ে দেখলুম স্থির। আজ তো বিদ্যুৎ বন্ধের দিন নয়। কি ব্যাপার, কারণটা কি ? কে বলতে পারে কারণ ? ওরে আজকের কাগজটা নিয়ে আয় তো ? কাগজ এল। হ্যাঁ এই তো প্রথম পাতাতেই রয়েছে, ব্যাণ্ডেলে গোটাকতক বয়লার পটল তুলেছে। বয়লারের বিকল হবার কারণ ? হ্যাঁ সে কারণও রয়েছে, খারাপ কয়লা। কোলিয়ারী খারাপ কয়লা দিচ্ছে কি কারণে ? কে বলতে পারে। দেখি রান্নাঘরে গিয়ে। 'তুমি কি আজকাল খারাপ কয়লা পাচ্ছ ?' 'আমি তো কয়লায় রাঁধি না। গ্যাসে

রাঁধি।' 'তাই নাকি? কয়লায় রাঁধনা কেন, কি কারণ?' 'কারণ মোটা হয়ে গেছি, কয়লায় রাঁধতে গেলে বসে বসে রাঁধতে হবে, ভুঁড়িতে লাগে!' 'বেশ! একটু চা খাওয়াবে?' 'দুধ ছাড়া খেতে হবে।' 'কারণ?' 'হরিণঘাটা আজ দুধ দেয়নি।' 'কারণ?' 'আস্ক হরিণঘাটা বাবা!' ইংরেজী বলছে যে! আমার সাদামাটা স্ত্রী হঠাৎ ইংরেজী বলতে শুরু করেছে কি কারণে? কারণ আর জানা হল না। কি কারণে? বেশী বকালে অফিসের ভাত পাব না।

অতঃপর চটি পায়ে গলিয়ে মিল্কবুথের দুগ্ধবালিকাদের কাছে গেলুম। 'আজ দুধ আসেনি কেন ভাই!' 'বাছুরে খেয়ে গেছে।' 'হরিণঘাটায় বাছুর, বাছুর এল কোথা থেকে, সেখানে তো সবই টিনের গরু। ন ভাই ঠিক বলছ না।' 'কি করব বলুন, সকাল থেকে ওই একই প্রশ্ন, মাথার ঠিক নেই। আজকের কাগজেই কারণ আছে।' আবার বাড়ি এসে কাগজ পেতে বসলুম। হ্যাঁ এই তো রয়েছে! করপোরেশান ঘোলা জল দিচ্ছে, গুঁড়ো দুধ গোলা যাচ্ছে না। করপোরেশান ঘোলা জল দিচ্ছে কেন? ও সে তো কমিশান বসেছে বোধ হয়!

স্ট্যাণ্ডে এসে দেখি বাস নেই, লোক থই থই করছে, সাড়ে আটটার খদ্দেরও দাঁড়িয়ে। ব্যাপার কি? দাঁড়িয়ে কেন? বাস নেই! বাস নেই কি কারণে? গুমটির স্টার্টার বেজার মুখে বললেন: কেন রোজই সেই এক প্রশ্ন! আমাকে জিজ্ঞেস করেন কি কারণে? স্টেট ট্রান্সপোর্টের চেয়ারম্যানকে

জিজ্ঞেস করুন। চেয়ারম্যানকে এখন এখানে এই মুহূর্তে পাই কি করে। স্ট্যাণ্ডের কাছেই বন্ধুর ওষুধের দোকান। গোটা-কতক চেয়ার আমাদের জন্যে পাতাই থাকে। বাস যখন থাকে না চেয়ার তখন থাকে। চেয়ারে বসা গেল। সুশীলবাবু দোকানের মালিক। ডাক্তারখানায় কিছুক্ষণ বসা মানেই গ্যারেজে গাড়ি রাখার মত ব্যাপার। ছোটখাটো মেরামতের কথা মনে পড়বেই। সকালে পায়খানার সময় মনে হল পেটটা যেন দুবার মোচড় দিল, গোটাকতক আমাশার বড়ি খেলে মন্দ হয় না। দাও সুশীল একপাতা অ্যান্টিএমিবিক কিছু। শরীরটা কেমন ম্যাজ ম্যাজ করছে, তেমন আর এনার্জি পাই না, দাও সুশীল একপাতা মাল্টিভিটামিন। আরে শরীরের মধ্যে লিভারটাই তো মেন, সেটাকেও তো একটু তোয়াজ করা দরকার। দাও সুশীল গোটা তিরিশ ওই অ্যালোপ্যাথিক কবরেজী বড়ি। বাসের পাত্তা নেই, এদিকে দশটাকার ওষুধ গস্ত হয়ে গেল। বন্ধু হলে হবে কি! সুশীলের কম মাথা! কেমন দু'টি চেয়ারফাঁদ পেতে রোগ ধরছে।

একটা বাস এল। হে-রে-রে-রে রে করে সকলে প্রাণের মায়া ছেড়ে দৌড়োলুম। ড্রাইভার, কনডাকটার সকলেই হাত পা নেড়ে বোঝাতে চাইছেন, এ বাস যাবে না। প্রচণ্ড আশাবাদী যাঁরা তাঁরা সিট আঁকড়ে বসে রইলেন। আমরা যারা ঝুলছিলুম নেমে এলুম। কনডাকটাররা গুমটির দিকে গটগট করে চলেছে—'হ্যাঁ ভাই যাবেন না কেন? হ্যাঁ ভাই?'

উত্তর কি আর দেয়! ছোট কথা কানে ঢোকে না, শেষে বিরক্ত হয়ে একজন বললেন, 'ড্রাইভারের আজ মন খারাপ'। আমরা কয়েকজন হুমড়ি খেয়ে পড়লুম, 'কেন কেন? মন খারাপের কারণ?' কনডাকটার বললেন, 'ব্যাচেলার লোক, কাল নাইট শোতে হিন্দি ছবি দেখে রেখার জন্যে মন খারাপ হয়েছে। সারারাত ঘুমোতে পারেনি, খালি এপাশ ওপাশ করেছে আর রেখা রেখা বলে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলেছে' ভিড়ের মধ্যে মায়ের মত চেহারার এক ভদ্রমহিলা ছিলেন, এগিয়ে এলেন। 'আহারে! তা হ্যাঁ ভাই একটা বিয়ে দিয়ে দিলে হয় না। আমার সন্ধানে ভাল মেয়ে আছে।' এক ভদ্রলোক মহিলাকে ঠেলে এগিয়ে এলেন সামনে 'কই কোথায়, পাইলটদা কোথায়?' উঃ কি খাতির, বাবাকে শালা বলে আর বাসের ড্রাইভারকে পাইলটদা। গুঁতোর চোটে রামনাম। একজন হাত তুলে চায়ের দোকানের বেঞ্চিতে বসে থাকা ঝাঁকড়াচুল জুলপিওলা গ্যাঁটাগোট্টা ভদ্রলোককে দেখিয়ে বললেন, 'ওই তো পাইলটদা।' যে ভদ্রলোক পাইলটদার খোঁজ করছিলেন তিনি একটু থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন, তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি খুব মজার মজার কথা বলতে পারি। একটু হাসাবার চেষ্টা করব? ভিড়ের মধ্যে থেকে আর একজন এগিয়ে এলেন, 'আমি গান গাইতে পারি।' দেখতে দেখতে সেই পাইলটদার দশ গজ দূরে একদল গুণী মানুষের জমায়েত তৈরি হল। কেউ নাচতে পারেন, কেউ গাইতে পারেন, কেউ ম্যাজিক জানেন,

একজন মাথা নিচু করে পা উপর দিকে তুলে পি-কক্ হয়ে হাঁটতে পারেন। আমি কিছু পারি কিনা একজন জিজ্ঞেস করলেন। 'অল্পস্বল্প অ্যাকটিং করতে পারি।' 'তাহলে দূরে দাঁড়িয়ে কেন? চলে আসুন, চলে আসুন, পাইলট-দার মেজাজ ঠিক করতে পারলেই বাস চলবে।'

পাইলটদা এদিকে নির্বিকার, বসে বসে সিগারেট খেয়ে চলেছেন। ইতিমধ্যে যিনি গাইতে পারেন তিনি টিফিন কৌটো বাজিয়ে গান ধরলেন, 'মেরা জুতা হায় জাপানী।' যিনি নাচতে জানেন তিনি পাছা দুলিয়ে ধুম ধুম করে খানিক নেচে নিলেন। ব্রিফ কেস মাটিতে রেখে জিমন্যাস্ট ভদ্রলোক ফুটপাতে পি-কক্ হয়ে পা দুটো খচাখচ নাড়তে লাগলেন। এইবার আমার পালা। গলা খাদে নামিয়ে শুরু করলুম, 'বাঙলার ভাগ্যাকাশে আজ···।' এত হট্টগোলের মধ্যেও কান আমাদের খাড়া ছিল। যতই হোক লম্বকর্ণের জাত তো! আর একটা বাসের আওয়াজ দূরে শোনা গেল। আমরা পোজিশান নেবার জন্যে হুড়মুড় করে দৌড়োতে শুরু করলুম। জিমন্যাস্ট ভদ্রলোক সোজা হতে ভুলে গিয়ে হাতেই ছুটছিলেন, আমি সোজা হবার কথা মনে করিয়ে দিলুম। বাস অবশেষে এল কুঁচকি কণ্ঠা বোঝাই হয়ে। মানুষের শরীর যেহেতু রবারের মত, আমরা আরো শ'দুয়েক ঠাসাঠাসি করে ধরে গেলুম। স্টার্টার পাইলটকে চেঁচিয়ে বললেন, 'মিউজিক,' তারপর নিজে হাতের পেনসিলটাকে কনসার্ট কনডাকটারের

কায়দায় দোলাতে লাগলেন, ড্রাইভার তখন তালে তালে বাসটাকে ব্রেক করে ছেড়ে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে সমস্ত ফাঁক-ফোকর ময়দা গাদা করে, বাসটাকে একপাশে ফেলে রেখে চা পিতে গেলেন। দেখতে দেখতে আমাদের ঘামে বাসের ভিতরে একটা জলাধার তৈরি হয়ে গেল। চোখের চশমার কাঁচ বাষ্পে ধোঁয়াটে হল। এতক্ষণ খেয়াল করিনি, জিমন্যাস্ট ভদ্রলোক আমার বুকের সঙ্গে লেপটে ছিলেন, ফিস ফিস করে বললেন, 'সরকার বাহাদুর আমাদের কত উপকার করেছেন বলুন তো। এই ধরনের সান বাথ নিতে গেলে, মিনিমাম পঞ্চাশ টাকা খরচ, আর এ দেখুন চল্লিশ পয়সায় হয়ে গেল।'

বকুলতলায় বাস থেকে নেমে বাঁচলুম। বাস-টার্মিনাস থেকে ছাড়তে যত গড়িমসি। রাস্তায় একবার গড়াতে শুরু করলে আবার উল্টো ব্যাপার। তখন থামান মুশকিল। বকুলতলায় বাসটা একটু থেমেই ভীষণ ঝাঁকি মেরে এগিয়ে গেল। একটা পা রাস্তায় আর একটা পা তখনো ফুটবোর্ডে। বায়ুসেবী সন্তানদের পায়ের জটলায় জড়াজড়ি হয়ে আছে। বেশ কিছুদূর বাসের সঙ্গে জড়ানো পা নিয়ে ক্যাঙারুর মত লাফাতে লাফাতে গেলুম। প্রথমে চোখ থেকে চশমাটা ছিটকে পড়ল তারপর এক এক করে খুচরো পয়সাগুলো পাশপকেট থেকে ছিটকে ছিটকে রাস্তায় পড়ে গড়িয়ে গেল, সবশেষে আমি পদচ্যুত হয়ে ছিটকে পড়লুম করপোরেশানের একটা ময়লা তোলা ঠ্যালাগাড়ির চাকার ওপর। এসব ঘটনা শহর

কলকাতায় এত স্বাভাবিক, কেউই গ্রাহ্য করে না, না পথচারী, না ভুক্তভোগী, না বাসযাত্রী। চটিটা খুলে বাসের পাদানিতে আটকে ছিল, কে দয়া করে লাথি মেরে পথে ফেলে দিল। সেটা চলন্ত বাস থেকে প্রায় বিশগজ দূরে গিয়ে পড়ল চিৎপাত হয়ে। বাঁ পায়ে চটি, ডান পা খালি। কাপড়ের কাছাটা খোলা। পাঞ্জাবি ঘামে জবজবে। বুকের কাছে আবার খানিকটা জায়গা সিঁদুরে লাল মনে হয় ধ্বস্তাধ্বস্তি করে নামার সময় কারুর সিঁথির সিঁদুর মুছে দিয়ে এসেছি। এই দাগটুকুই নিট লাভ। ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে গিয়ে জুতোটা উদ্ধার করে নিয়ে এলুম। ইতিমধ্যে কাছাটাও সামলে নিয়েছি। খুচরো পয়সার কিছু কুড়িয়ে পেলুম, কিছু গড়িয়ে চলে গেছে। চশমাটা নাকের ডগায় চলে এসেছে।

অফিসে তখন টেবিলে দ্বিতীয় দফার চা পড়ে গেছে। বড়বাবু পেনসিল দিয়ে কানের গর্তে সুড়সুড়ি দিতে দিতে একচোখ আধবোজা আর একচোখ খোলা রেখে প্রশ্ন করলেন: কি ব্যাপার মশাই, আজ এত দেরি, কারণ কি? চেয়ারে নিজেকে আস্তে আস্তে বসিয়ে মুখে কয়েকটা হাসির রেখা ভাসিয়ে উত্তর দিলুম, 'একাধিক'। পেনসিলটাকে কান থেকে বের করে সামনের ফাইলে একটা পদ্মফুল আঁকতে আঁকতে বড়বাবু বললেন, 'শুনি'। আমি গেঞ্জির সুতোর মত কারণের সুতো ফড়ফড় করে খুলে গেলুম:

'ভোর সাড়ে চারটের সময় উঠে আমি এক গেলাস ত্রিফলার

জল খাই, তারপর খাই এক গেলাস গরম চা, তারপর বার দশেক পেটটাকে থামচে বাথরুমে যাই। আজ হল কি, ভোরে বৃষ্টি, ঘুম ভাঙল না, যখন ভাঙল তখন সাড়ে ছটা। এই বেলায় ঘুম ভাঙলেই সর্বনাশ!' বড়বাবুকে সাসপেন্সে রেখে, একটু জল খেলুম! তারপর আবার শুরু করলুম। 'যাই আর আসি কিছুতেই তিনি খালাস চান না। কাপের পর কাপ চা। খাবার ঘরে খালি কাপের লাইন পড়ে গেল। আমার স্ত্রীকে বলাই আছে, এ রকম পরিস্থিতিতে যেমন করেই হোক আমাকে একটু ভয় পাইয়ে দিতে হবে। দিলেই কাজ সারা। কারণ আমার একটু নার্ভাস ডায়েরিয়ার ধাত আছে। স্ত্রী ডালের হাতা ধরে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, 'তোমার মেয়ে আসছে কাল'। ব্যস সেই যে বাথরুমে ঢুকলুম, পেটে পিঠে এক হয়ে পিচবোর্ড হয়ে গেল'।

বড়বাবু পদ্মফুলের পাপড়িগুলোকে বেশ খেলাতে খেলাতে বললেন 'সেটা আবার কি? মেয়ে আসছে বলায় ভয় পাবার কারণ?'

'কারণ মেয়ে নয় আমার নাতি। যে সকালে কাঁদে, দুপুরে কাঁদে, রাতে কাঁদে, মাঝরাতে কাঁদে। আর যখন কাঁদে না তখন সমস্ত কিছু ভাঙে, কাপ ভাঙে, ডিশ ভাঙে, কাঁচের গেলাস ভাঙে, চশমা ভাঙে, দেয়াল ভাঙে, দরজা জানলা আঁচড়ায়। শেষে হাতের কাছে কিছু না পেলে যাকে পায় তাকে খামচায়।'

'হু, এ তো দেখছি ব্রাওনিয়ার কেস' বড়বাবু পেনসিল চিবোতে

চিবোতে বললেন। ভদ্রলোক হোমিওপ্যাথি চর্চা করেন। স্ত্রী আর শিশুরোগে বিশেষজ্ঞ। অফিসের তাবৎ মহিলা তাঁর পেশেণ্ট।

বড়বাবু বললেন, 'হোমিওপ্যাথি কথা বলে, বুঝেছেন মশাই। ওই যে রেবা দত্ত —।' কথাটা শেষ না করে শূন্যে ঝুলিয়ে রাখতে হল, কারণ একটু দূরেই রেবা দত্ত বসে বসে একটা ঢাউস উপন্যাস পড়ছিলেন, বই থেকে চোখ তুলে কটমট করে বড়বাবুর দিকে তাকালেন। বুঝলাম রেবা দত্তর গুহ্য তত্ত্ব অফিসে ফাঁস হয়ে যাক, এটা তার পছন্দ নয়। বড়বাবু প্রসঙ্গ পালটে বললেন, 'আমি আপনাকে কয়েক পুরিয়া দিয়ে দেবো, দেখবেন নাতি আপনার বাল-গোপাল বনে গেছে।' আমি আশান্বিত হয়ে বললুম, 'আপনার কাছে এমন ওষুধ আছে যা আমাদের বাসগুমটির স্টার্টারকে খাওয়ালে সহজে বাস পাওয়া যাবে? ব্রেকডাউনের প্যাঁচ ফেলে আমাদের বাপের নাম খগেন করে দেবে না?' বড়বাবু হাসি হাসি মুখে বললেন, 'সব আছে বাবা, সব আছে। তবে কি জানেন সিমটম দেখে চিকিৎসা। কয়েকটা খবর আমার চাই, যেমন লোকটিকে দেখতে কেমন, রোগা না মোটা, কালো না ফর্সা? টক খেতে ভালবাসে, না ঝাল কিম্বা মিষ্টি? ডান পাশ ফিরে শোয়, না বাঁ-পাশ, অথবা চিৎ হয়ে? নাক খোঁটে কিনা? ফ্যামিলিতে কারুর একজিমা ছিল কিনা! সামনের দাঁত দুটো কেমন? মাথার চুল পাতলা না ঘন? 'বড়বাবুর ফিরিস্তি আর শেষ হল না।

সেদিন অফিস থেকে প্রায় হেঁটেই বাড়িতে ফিরতে হল। কারণ ? কারণ একাধিক। ময়দানে খেলা ছিল, পথে মিছিল ছিল, রাস্তায় বৃষ্টির জল ছিল, আকাশে মেঘ ছিল, গ্যারেজে গাড়ি বসেছিল, বাস যাত্রী বহন না করে বরযাত্রী বহন করছিল, ট্রাম আউটলাইন হয়েছিল, ট্যাক্সি স্ট্রাইক করেছিল।

পাড়ায় যখন ঢুকলাম বেশ রাত। বাড়িতে আলো থাকলেও রাস্তায় একটাও আলো নেই, ঘোর ঘন অন্ধকার রাস্তার এক-পাশে পর্বত প্রমাণ মাটি। তিলোত্তমা কলকাতার অঙ্গ প্রসাধন। রাস্তার মুখটাতেই বৃদ্ধ ঘনশ্যামবাবু রাস্তার একপাশে লাঠিতে ভর দিয়ে উবু হয়ে বসে আছেন। চোখে রুপোর ডাঁটির ঘোলাটে চশমা। আমার পায়ের শব্দ পেয়ে বললেন, 'কে যায় ?'

নাম বললুম। বৃদ্ধ বললেন, 'তা বেশ, আজ কেমন ?'

কুশল বিনিময়ের পর জিজ্ঞেস করলুম, 'ওখানে অন্ধকারে বসে কেন ? বাড়ি যাবেন না ?' 'যাবো রে ভাই যাব, রাত ন'টায় চাঁদ উঠবে, তখন গলিটায় একটু আলো পড়বে সেই সময় ঠুকঠুক করে চলে যাব, তার আগে যাই কি করে অন্ধকারে !'

ঘনশ্যামবাবুকে চাঁদের আশায় গলির মুখে বসিয়ে রেখে বাড়ি ঢুকে চা খেতে খেতে দেখি আকাশে ঘন কালো মেঘ। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। পুবের আকাশে চাঁদ উঁকি মেরেই মেঘের তলায় ঢুকে গেছে। দেখে ভীষণ ভয় হল। চাঁদ যদি না ওঠে ঘনশ্যামবাবু সারারাত গলিতে উবু হয়ে বসে বসে ভিজবেন সূর্য ওঠার অপেক্ষায়।

প্রেম

আমার সেই বয়েসে একবার প্রেমে পড়ার ভীষণ ইচ্ছে হয়েছিল। সেই বয়েস? যে বয়েসে ঠোঁটের ওপর কচি কচি গোঁফের দুর্বো জন্মায়। দাড়িতে দু-এক গাছা ছাগুলে চুল দেখা দেয়। গলাটা একটু ভারি ভারি হয়। মানুষ পাকা পাকা কথা বলতে শেখে। সবজান্তা, হাম-বড়া ভাব। লঘু গুরু জ্ঞানশূন্য। সব কথাতেই এক কথা, যান যান, আপনি কি বোঝেন, আপনি কি জানেন? সেই বয়েস।

প্রেমে পড়তে হলে একটি মেয়ে চাই। যে-সে মেয়ে হলে হবে না। সুন্দরী হওয়া চাই। ডানা-কাটা না হোক, দেখলে যেন প্রেমের উদয় হয়। নায়িকাদের বর্ণনা কত উপন্যাসে পেয়েছি। ছায়াছবির পর্দায় দেখেছি। চাঁদের আলোর ঝিলিক ফুটছে। গাছের ডাল ধরে নায়িকা গান গাইছে। ঝোপে কোকিল ডাকছে কু-উ-উ।

আমার বন্ধু সুখেন সেই বয়েসেই আমার চেয়ে অনেক

বেশি পেকেছিল। হিন্দী সিনেমা হুমুড়ি চালে দেখত। ইংরেজি ছবির হিরো-হিরোইনের নাম কণ্ঠস্থ ছিল। বুকপকেটে ম্যারিলিন মোনরোর ছবি পুষত। সে এক ছেলে ছিল বটে।

সুখেন বললে, সব মেয়েই তো আর প্রেমে পড়ে না। যেমন ধর, সকলের সর্দি হয় না। ন'মাসে ছ'মাসে হয়তো একবারই হল। কারুর আবার বারো মাসই সর্দি। সকাল হল তো ফ্যাচোর ফ্যাচোর হাঁচি। একে বলে সর্দির ধাত। এই রকম কারুর কাশির ধাত, কারুর পেট খারাপের ধাত। সেই রকম কোন কোন মেয়ের প্রেমের ধাত থাকে। ধাত বুঝে এগোতে হয়।

সে আমি কি করে বুঝব ভাই ?

খোঁজখবর নিতে হবে। অতই সোজা চাঁদু। ঘুরে ঘুরে বাজার দেখ। তারপর ঝোপ বুঝে মার কোপ। রাস্তায় ঘাটে, বাসে ট্রামে যেখানেই দেখবি কোন মেয়ে তোর দিকে পুটুস করে তাকিয়েছে, তুই ক্যাবলার মত চোখ সরিয়ে নিবি না, তুইও তাকাবি কটমট করে। বড় বড় চোখে। মেয়েটা যদি আবার তাকায়, তোর চোখে চোখ পড়বেই। চোখে জাদু থাকে, জানিস ?

না ভাই।

কি জানো তুমি ? চোখের ফাঁদে আটকে ফেলবি। চোখে হাসবি। চোখে চোখে বলবি, সুন্দরী, তুমি আমার, তুমি

আমার। সম্মোহিত করে ফেলবি। নিজেকে ভাববি অজগর, সামনে তোর হরিণী।

তুই চোখ মারতে বলছিস? ও ভাই অসভ্য ছেলের কাজ।

তুই একটি গর্দভ। চোখ মারা নয়। চোখে ভাবের খেলা। সুচিত্রা সেনের অভিনয় দেখেছিস? এই চোখে জল, এই চোখে হাসি, এই চোখে প্রেম, এই চোখে ঘৃণা। সব চোখে। চোখেই মনের প্রকাশ। তেমন ভাবে তাকাতে পারলে রয়েল বেঙ্গল ল্যাজ গুটিয়ে পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে।

ও ভাই আমি পারব না। আমার ক্ষমতায় কুলোবে না। আমি কি সুচিত্রা সেন?

দূর মড়া! সুচিত্রা সেনের মত অভিনয় ক্ষমতা, চোখের ভাষার কথা বলছি। বাড়িতে বড় আয়না আছে?

তা আছে।

আয়নার সামনে দাঁড়াবি, দাঁড়িয়ে চোখের ট্রেনিং শুরু করবি। ঘরে কাউকে ঢুকতে দিবি না। হাসবি কাঁদবি রাগাবি গলবি চমকাবি চমকে দিবি। মুখের কিন্তু কোন পরিবর্তন হবে না। সব চোখে। চোখকে খেলাবি। এই হল তোর প্রেমের প্রথম পাঠ। এইটে উতরে গেলে দ্বিতীয় পাঠ পাবি।

মনে মনে ব্যাপারটা চিন্তা করে সুখেন ইয়ারকি করছে বলে মনে হল না। সত্যিই তো, বশীকরণ বলে একটা ক্রিয়া অবশ্যই আছে। তা না হলে পাঁজিতে এত বিজ্ঞাপন থাকে

কেন? জাত্বকর পি. সি. সরকার হল-স্বদ্ধ লোককে হিপনোটাইজ করে কত খেলাই তো দেখিয়ে গেছেন। সেই সময়ের খেলা! নটার সময় সাতটা বাজিয়ে ছেড়ে দিলেন!

আমাদের পাড়ার কার্তিককে মেসমেরাইজ করে এক গুণী ব্যক্তি নাম রেখে গেলেন কাকাতুয়া। বলেছিলেন ফিরে এসে ঠিক করে দোব। তিনি আর ফিরলেন না। সেই থেকে কার্তিক কাকাতুয়া। কাকাতুয়া বললে সাড়া দেয়। কার্তিক বললে সাড়া দেয় না।

তুপুরবেলা বড় বউদির ঘরে চোখের ট্রেনিং শুরু হল। কেউ যেন আবার দেখে না ফেলে। সব তাহলে কেঁচে যাবে। বাড়িতে প্রাণীর সংখ্যা নেহাত কম নয়। তুপুরের দিকে খাওয়া-দাওয়ার পর সবাই ধুঁকতে থাকে। বড় বউদির নাক ডাকে। আমার ছোট বোন পিয়া কলেজে চলে যায়। এই হল সাধনার উপযুক্ত সময়।

নিজের চোখ আগে কখনও আমি এমন করে দেখিনি। কেউ দেখেছেন কি না সন্দেহ আছে। আমরা সাধারণত আয়নার সামনে দাড়াই। ঝট্ করে চুল আঁচড়াই, সট্ করে সরে আসি। এ একেবারে নিজের মুখোমুখি, ফেস টু ফেস। নিজেকে নিজে দেখা। কখনও প্রেমের দৃষ্টিতে, কখনও ঘৃণার দৃষ্টিতে, কখনও আমন্ত্রণের দৃষ্টিতে আও না পেয়ার করে, লাভ করে, আও না।

তুপুরটা কয়েক দিন এইভাবেই বেশ কাটল। দৃষ্টিতে দৃষ্টি

ঠেকিয়ে। নিজের সঙ্গে নিজে চোখে চোখে কথা বলে। হঠাৎ একদিন পিয়ার কাছে ধরা পড়ে গেলুম। আমি জানতুম না ধরা পড়ে গেছি। পিয়া কোন্ সময় পিছন থেকে দেখে সরে পড়েছে। মনে হয় একটু ভয়ও পেয়েছিল। চুপি চুপি বড় বউদিকে বলেছিল, দাদা দুপুরবেলা তোমার ঘরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কি করে বল তো। আমাদের পুসীটাকে আয়নার সামনে বসিয়ে দিলে ঠিক ওই রকম করে। ফ্যাস-ফোঁস, থাবা-মারা।

বড় বউদি বড় চালাক মেয়ে। দুপুরে বিছানায় পড়ে রইলেন মটকা মেরে। সাধনার পথে বেশ কিছু দূর এগিয়েছি। একেবারে তন্ময়। চোখে চোখে হাসি চলছে। বউদি বললে, কি হচ্ছে?

চমকে উঠেছিলুম। ধরা পড়ে গেছি. কি লজ্জা!

বললুম, অভিনেতা হব তো, তাই একটু চোখ সাধছি।

সে আবার কি? লোকে তো গলা সাধে, চোখ সাধা জিনিসটা কি?

আছে, আছে। সে তুমি বুঝবে না বউদি।

কোনরকমে পালাতে পারলে বাঁচি। ছাদের ঘরে পুরনো বইয়েব গাদা থেকে ছেড়া ছেড়া একটা বই পেলুম, ত্র্যাটক সাধনা। তিন-চার হাত দূরে দেওয়ালের গায়ে সবুজ একটা বিন্দু লাগিয়ে, পদ্মাসনে বসে, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাক, যেন চোখের পলক না পড়ে। পাঁচ সেকেণ্ড, দশ সেকেণ্ড, মিনিট, এক দুই পাঁচ দশ, ঘণ্টায় চলে যাও। তারপর দিনে।

'তোমার চক্ষুর্দ্বয়ে জ্যোতি খেলিবে। অলৌকিক দৃশ্যসমূহ চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠিবে। চরাচরে তোমার দৃষ্টি প্রসারিত হইবে। উড্ডীয়মান পক্ষীর দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকাইলে ভস্ম হইয়া পড়িয়া যাইবে। যাহার দিকে তাকাইবে সেই তোমার বশীভূত হইয়া কুক্কুর কুক্কুরীর ন্যায় পদপ্রান্তে পতিত হইবে, কম্পমান শাখার ন্যায়।'

ভজন করনা চাহি রে মনুয়া, সাধন করনা চাহি রে মনুয়া। সেই সাধনে অ্যায়সা ফল ফলল! একদিন রাস্তা দিয়ে দুটি মেয়ে চলেছে। একটিকে মনে বড় ধরে গেল। মনে হল প্রেমের ধাত। সুখেন যেমন বলেছিল. সর্দির ধাত, কাশির ধাত, পেটের অসুখের ধাত। মিষ্টি, নরম নরম চেহারা। অবাক জলপানের মত মুখ। মা দুর্গার মত চোখ। ডুরে শাড়ি পরেছে। রাস্তায় যেন কাঁপন ধরেছে।

ভ্রূচাপে নিহতঃ কটাক্ষবিশিখো নির্ম্মাতু মর্ম্মব্যথাং
শ্যামাত্মা কুটিলঃ করোতু কবরীভারোঽপি মারোদ্যমম্।
মোহস্তাবদয়ঞ্চ তন্বি তনুতাং বিম্বাধরো রাগবান্
সদবৃত্ত-স্তনমণ্ডলস্তব কথং প্রাণৈর্ম্মম ক্রীড়তি॥

টাটকা গীতগোবিন্দ ভলকে ভলকে বেরিয়ে আসতে লাগল। হে সুন্দরী, তোমার নজরোঁকা তীর ভুরুর ধনুর ছিলে টেনে অমন করে আর মেরো না। আমার মর্ম ফেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। তোমাকে দোষ দিচ্ছি না সখি। এ তো তোমার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। তোমার কালো কুটিলকেশ আমাকে প্রায় মেরে

ফেলেছে, এও স্বাভাবিক। তোমার বিম্বফলতুল্য রাগযুক্ত অধর আমার মোহ উৎপাদন করছে, তাতেও দোষের কিছু নেই। কিন্তু তোমার ওই সদবৃত্তস্তনমণ্ডল কেন আমার প্রাণ নিয়ে এমন ছিনিমিনি খেলবে! আমি সইতে পারি, না বলা কথা, মন নিয়ে ছিনিমিনি সইব না, সইব না। গীতগোবিন্দ আবৃত্তি করে ভীষণ সাহস এসে গেল। বল বীর নয়, তাকাও বীর। কি ভাবে তাকিয়েছিলুম জানি না। একটি মেয়ে আর একটিকে বললে, গ্যাখ ভাই, পাগলটা তোর দিকে কি ভাবে তাকিয়ে আছে! তারপর রাস্তায় ষাঁড় দেখে মেয়েরা যে ভাবে হুটোপাটি করে পালায়, সেইভাবে দুজনে, গলাগলি, টলাটলি করতে করতে পালাল। একজনের পা থেকে চটি ছিটকে নর্দমায় পড়ে গেল। অনেক দূরে গিয়ে তারা আর একবার ফিরে তাকাল ভয়ে ভয়ে। যেন দেখছে ষাঁড়টা কত দূরে!

মনে বড় ব্যথা পেলুম। আরও অবাক হলুম, সবাই যখন বলতে লাগল চোখ রাঙাচ্ছ কেন? তোমার চোখ রাঙানির আমরা তোয়াক্কা করি না হে। যার দিকে তাকাই তিনি একই কথা বলেন, চোখ পাকাচ্ছ কেন? মাথা ঠাণ্ডা কর, মাথা ঠাণ্ডা কর। গুরুজনের সঙ্গে কথা বলার সময় একটু সমীহ করে বলতে হয়!

বড় বউদির আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেই চমকে উঠলুম, এ আবার কে রে! চোখ দেখলে মনে হয়, এখুনি গেয়ে উঠবে, 'ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান'। চোখের

পাতা পড়ছে না, মণি দুটো পাথরের মত স্থির। নিজেকে দেখে নিজেই ভয় পেয়ে যাচ্ছি। কান ধরে বলতে ইচ্ছে করছে, আর করব না স্যার।

চোখের ডাক্তার বললেন, এ কি করে এনেছ হে। একে বলে চোখ ঠিকরে যাওয়া। কি করে এ রকম করলে? ভূত দেখলে এ রকম হতে পারে। আমরা পড়ে এসেছি। দেখলুম এই প্রথম। তুমি বোসো, বোসো।

আউটডোরে কোন পেশেণ্ট কখনও এমন খাতির পায় না। আমাকে চেয়ারে বসিয়ে, অন্য রুগীদের বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে, তিনি একের পর এক ছাত্র আর অন্যান্য ডাক্তারদের ডেকে এনে দেখাতে লাগলেন। এ রেয়ার কেস, পড়া ছিল, দেখা ছিল না। তাঁরা আসেন, সামনে ঝুঁকে পড়ে দেখেন, চোখে যন্ত্র লাগান, আর বলেন, রেটিনা হুপ করে বেরিয়ে আসছে। ডাক্তারী ভাষা বোঝা যায় না। রেটিনা শব্দটা চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। হুপ্ শব্দ তো হনুমানে করে। তার মানে, কিছু একটা হনুমানের মত লাফিয়ে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে।

চোখের পাওয়ার মাপতে মাপতে ডাক্তারবাবু বললেন, সত্যি করে বল তো বাবা, কি করে এমন করলে? ভূত নিশ্চয়ই দেখনি, চোখের সামনে কাউকে কি খুন হতে দেখেছ?

আজ্ঞে, ত্র্যটক সাধনা।

সেটা কি বস্তু ভাই? পিশাচ সাধনার ধরনের কিছু?

আজ্ঞে না, দেয়ালে সাঁটা একটা সবুজ বিন্দুর দিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকিয়ে বসে থাকা।

সর্বনাশ ! একে বলে ফিক্সড স্টেয়ার। আই বল সকেটে সেঁটে গেছে। এ দুর্বুদ্ধি তোমাকে কে দিলে ?

আজ্ঞে, প্রাচীন গ্রন্থ।

সেটিকে পুড়িয়ে ফেল। খবরদার, ওসব আর ভুলেও করতে যেও না। এই নাও তোমার চশমার পাওয়ার। সঙ্গে গোটাতিনেক ব্যায়াম রইল। প্রথম : চোখ নাচানো। ডাইনে ঘোরাও, বাঁয়ে ঘোরাও, ওপরে তোল, নিচে নামাও। দ্বিতীয় : ব্লিংকিং, অনবরত চোখ পিটপিট কর। নন-স্টপ। তৃতীয় : কাপিং। হাতের তালু দিয়ে দু'চোখ ঢেকে, মাথা পেছনে হেলাও। শেষ উপদেশ : সুখে আছ, তাই থাক, ভূতের কিল খেতে যেও না, কেমন ?

চোখ বাঁচাতে শুরু হল চোখের ব্যায়াম। চোখ ঘোরানো, চোখ নাচানো, চোখ পিট পিট, পাতা ফেলা আর খোলা। সুখেন ঠিকই বলেছিল, চোখ বড় সাংঘাতিক জিনিস। সেই সময় বাজারে একটা গানও বেরিয়েছিল, বলা কি যায় সহজে, বুঝে নাও, বুঝে নাও চোখের ভাষা। চোখ ওই রকম করতে করতে এমন মুদ্রাদোষ দাঁড়িয়ে গেল, সব সময়েই করে চলেছি, অজান্তেই করে চলেছি।

পিতৃবন্ধু বিধুজ্যাঠার মাথায় মাথায় তিন মেয়ে। সব ক'টি মেয়েই বেশ সুন্দরী। পিতৃদেব একদিন সকালে বললেন,

বিধুবাবুর বাড়ি থেকে চট করে একবার গুপ্তপ্রেস পাঁজিটা নিয়ে এসো তো।

বিধুজ্যাঠার বাড়িতে কড়া নাড়তেই দরজা খুলে দিল বড় মেয়ে রেখা। জিজ্ঞেস করলুম, বিধুজ্যাঠা আছেন, বিধুজ্যাঠা?

রেখা কেমন যেন থতমত খেয়ে গেল। আমতা আমতা করে বললে, হ্যাঁ, বাবা আছেন।

রেখা পেছোতে শুরু করেছে। চোখেমুখে একটা ভয়, একটা কেমন যেন বিস্ময়ের দৃষ্টি। আমি এক পাও এগোইনি, দরজার বাইরেই দাঁড়িয়ে আছি।

আমি বললুম, একবার ডেকে দাও তো, একবার ডেকে দাও তো।

রেখা প্রায় ছুটে বাড়ির ভেতর চলে গেল। যেতে না যেতেই বিধুজ্যাঠা এলেন, পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি। আদুর গা। সাদা মোটা পইতে বুকের এপাশ থেকে ওপাশে চলে গেছে। চোখ দুটো ভাঁটার মত লাল।

বাঁজখাই গলায় বললেন, কি চাই?

সাধারণত এভাবে কথা বলেন না। অবাক হলুম। বললুম, পাঁজি আছে, পাঁজি, বাবা একবার চাইলেন।

হ্যাঁ, আছে ছোকরা—বলে ঠাস করে গালে এক বিরাশি সিক্কার চড় হাঁকড়ালেন।

এ আবার কি? চড় আবার কবে থেকে পাঁজি হল!

কিছু বোঝার আগেই আমার হাত ধরে হিড় হিড় করে টানতে লাগলেন, আর বলতে লাগলেন, চল তোমার বাবার কাছে।

তিন মেয়ে রকে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল, অসভ্য ছেলে।

বাড়ির সামনের হারাধন মুদী দোকানের টাটে বসে বসেই চেল্লাতে লাগল, কি করেছে জ্যাঠামশাই, কি করেছে জ্যাঠামশাই ?

আমি হাঁ হয়ে গেছি। অপরাধ জানলুম না, ফাঁসিতে চলেছি।

বাবা বললেন, কি, করেছিল কি, বিধুদা ? জুতো পায়ে ঠাকুরঘরে ঢুকেছিল ?

তার চেয়েও অনেক, অনেক গর্হিত কাজ, চোখ দিয়ে আমার মেয়েদের অশ্লীল, কামার্ত ইঙ্গিত করেছে।

ইজ ইট ?

ডিফেন্সের কোন সুযোগই পেলুম না। কিল, চড়, ঝাঁটা, জুতো, লাঠি। মিনিট দশেক শরীরের ওপর দিয়ে ভূমিকম্প চলে গেল। বড় বউদি এসে উদ্ধার করলেন। বড়দা বেরিয়ে এসে বললেন, কি, হয়েছে কি ?

বাবা আর বিধুজ্যাঠা দুজনেই সমস্বরে আমার অপরাধ পেশ করলেন।

বড়দা বললেন, ছি ছি, না জেনেশুনেই, এত বড় একটা ছেলের গায়ে হাত তুললেন ? সম্পূর্ণ নিরপরাধ একটা ছেলের

গায়ে ? জানেন না, ও গুরুতর একটা চোখের অসুখে ভুগছে। মেজর মিত্রর চিকিৎসায় আছে।

দুজনেই সমস্বরে বললেন, অ্যাঁ! বল কি ? কই, তোমরা আগে তো কিছু বলনি! ছি ছি ছি।

বিধুজ্যাঠা আমার পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, ক্ষমা কর বাবা। তুমি একবার আমার বাড়িতে চল। আমরা সবাই মিলে তোমার কাছে ক্ষমা চাই।

কাঁদো কাঁদো গলায় বললুম, আজ আর আমার যাবার মত অবস্থা নেই জ্যাঠামশাই।

বিকেলের দিকে ভীষণ জ্বর এসে গেল। চোখ বুজিয়ে পড়ে আছি। সর্বাঙ্গে বিষ ফোড়ার মত ব্যথা। বউদি এসে কপালে হাত রেখে বললে, দেখ, কে এসেছে তোমাকে দেখতে ?

চোখ খুলে দেখি রেখা।

ভয়ে চোখ বুজিয়ে ফেললুম। যা দেখেছি তাই যথেষ্ট। এখনও হয়তো আমার চোখ সেই ভাবেই নাচছে। আবার না জুতো খেতে হয়!

বউদি বললেন, তাকিয়ে দেখ কে এসেছে ?

আমি ইচ্ছে করে প্রলাপ বকতে লাগলুম, না না, আমি আর যাব না, আর পাঁজি আনতে যাব না মা!

রেখা ফোঁস ফোঁস করে কেঁদে উঠল, বউদি, আমিই দায়ী, আমিই দায়ী। কিছু হবে না তো ? সেরে উঠবে তো ?

বউদি বললেন, সারা শরীর বিষিয়ে উঠেছে। তা ছাড়া বড় অভিমানী ছেলে, দেহের চেয়ে, মনে বেশি লেগেছে।

*   *   *   *

চার বছর পরে মুসৌরীর এক হোটেলে আমি আর রেখা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। কাঠের মেঝের ওপর আমাদের সুটকেস। তখনও খোলা হয়নি। সামনে কাঁচের জানালা। সকালের রোদে হিমালয়ে সোনা খেলছে। রেখার কাঁধে আমার একটা হাত। রেখার একটা হাত আমার কোমরে। রেখার মাথা আমার কাঁধে।

আমি বলছি, সেদিন জুতো খাইয়েছিলে, আজ অন্য কিছু খাওয়াও।

রেখা বলছে, আজ যদি বাবা বেঁচে থাকতেন ?

আমি বলছি, আজ যদি দাদা বেঁচে থাকতেন ?

চারপাশ ঝাপসা হয়ে আসছে। দরজার কাছ থেকে হোটেল-বয় বলছে, কফি, মেমসাব !

শেষ যাত্রা

বৃন্দাবন বসাক মারা যাচ্ছেন। বাড়িতে নয় হাসপাতালে। পয়সাকড়ি আছে। পয়সার জোরে সেরা হাসপাতালে স্থান পেয়েছেন। স্পেশাল নার্স নিযুক্ত করা হয়েছে, সর্বক্ষণ তদারকি করার জন্যে। বুড়ো ইদানিং খুব খিটখিটে হয়ে গিয়েছিলেন। ছেলে আর ছেলের বউরা মিলে হাসপাতালে ভরে দিয়ে এসেছে।

আত্মীয়স্বজন, পুত্র, পুত্রবধূ, ডাক্তার, নার্স, চারপাশে সবাই ছড়িয়ে রয়েছে। ডাক্তার এই শেষসময় বিশেষ খোঁচাখুঁচি করতে চাইছেন না। ইংরেজীতে বলছেন—লেট হিম ডাই পিসফুলি। পুত্রবধূরা নানারঙের সিনথেটিক শাড়ি পরেছেন। সেণ্ট মেখেছেন। চোখে কাজল টেনেছেন। গায়ে গন্ধ মেখেছেন। কায়দা করে খোঁপা বেঁধেছেন।

বড়ছেলে অল্প একটু দূরে দাঁড়িয়ে দামী সিগারেট খেতে খেতে মেজকে বলছেন, বউবাজার থেকে ভাল দেখে একটা খাট আন, নিউমার্কেট থেকে ফুল আন। মেজ বলছেন—আনতে চলে গেছে।

মেজ ছেলের চামড়ার কারখানা। কারখানার কর্মচারীদের এই সব কেনাকাটার কাজে লাগান হয়েছে। ফোরম্যান নিজে তদারকি করছেন। তিনি খাট কিনতে কিনতে ভাবছেন—শালারা পাঁচশো টাকা মাইনে দেয়, এই মওকায় শ তিনেক ঝেঁপেনি। পাশে একজন মেকানিক দাঁড়িয়ে ছিল ল্যাংবোটের মত। তাকে বললেন—রাজু টেম্পো বোলাও! ফার্নিচারের দোকান থেকে রাজু বেরিয়ে যেতেই মালিককে বললেন—খাটটার একটা ভাউচার করে দিন, পাঁচশো লিখবেন না, সাতশো লিখুন।

মেজপুত্রবধূ বড় বউকে বললেন—বড়দি গঙ্গাজল রেডি কর। বড় ছোট হাত আয়নায় মুখ দেখছিলেন। সেটাকে হাত ব্যাগে ভরে, ছোট একটা শিশি বের করলেন, তারপর ব্যাগটা হাঁটকে, পাঁটকে আক্ষেপের সুরে বললেন—ইস রুপোর চামচেটা আনতে ভুলে গেছিরে মেজো। স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন—একটা চামচে আনিয়ে দেবে! ডাক্তারবাবু ঘড়ি দেখে বললেন—চামচে আনবার আর সময় নেই এই নিন ড্রপার।

মেজ বললেন—ভাল করে ধোয়া তো?

বড় ছেলে বললেন—এখন আর অত বাছ-বিচার কি? লাস্ট মোমেন্ট? চল এক এক ফোঁটা করে মুখে দিতে থাকি। লাস্ট রাইটস—শেষকৃত্য।

বড় ড্রপার হাতে বাপের কাছে এগিয়ে যেতেই বৃন্দাবন ফিস ফিস করে বললেন—তাড়া আছে?

বড় ছেলে চমকে সরে এসে ডাক্তারকে বললেন--হি ইজ টকিং।

ডাক্তার বললেন—সজ্ঞানেই মৃত্যু হবে। যে কলে মানুষ চলে তার সবই প্রায় থেমে এসেছে ; স্রেফ ইচ্ছাশক্তির জোরেই বেঁচে আছেন। ইচ্ছাশক্তির আর জোর কতটুকু বলুন ? গেল বলে।

বড় ছেলে স্ত্রীর হাতে শিশিটা ফিরিয়ে দিয়ে বললেন—নাঃ ঝামেলা হয়ে গেল, সন্ধ্যের সময় আমার একটা ককটেল পার্টি ছিল।

বউ বললেন—আমারও তো একটা এনগেজমেণ্ট ছিল। কি আর করবে বল ? কর্তব্য তো করতেই হবে।

বড় ডাক্তারের কাছে সরে এসে বললেন—মানুষের ইচ্ছা-শক্তিটাকে মেরে ফেলা যায় না ? ওটা কি ক্রিমিন্যাল অফেন্স ?

ডাক্তার বললেন—ওর যেমন বাইরে থেকে জন্ম দেওয়া যায় না, মারাও যায় না। ওটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। একটু ধৈর্য ধরুন। শক্তিটা অটোমেটিক কমে আসবে।

—মহা মুশকিল হল, বলে বড় ঘন ঘন সিগারেট টানতে লাগলেন।

এমন সময় মেজ ঘরে ঢুকে বললেন—দাদা খাট আর ফুল এসে গেছে। কত দেরি ? বড় আক্ষেপের সুরে বললেন—এখনও তো স্পষ্ট কথা বলছেন।

—মাই লর্ড ? তাহলে কি হবে ?

—তোরা থাক, আমি ঝট করে একটা কাজ সেরে আসি।

বড় বেরিয়ে গেলেন। মেজ শিশি আর ড্রপার হাতে বাপের কাছে এগিয়ে যেতে বৃন্দাবন সেই একই কথা বললেন —তাড়া আছে?

মেজ বিমর্ষ হয়ে ফিরে এলেন। বউকে বললেন, তোমরা থাক, আমি চট করে একটা কাজ সেরে আসি।

—এর মধ্যে যদি মারা যান?

—ভয় নেই, নিচে সব ব্যবস্থা রেডি করা আছে। লোকজন আছে।

বউমা তখন ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কি? একটু তাড়াতাড়ি করা যায় না?

—জন্ম-মৃত্যু কি বলা যায় মা! যখন হবার তখন ঠিকই হবে।

বড় বউ একটা চেয়ারে বসে ম্যাগাজিন পড়তে লাগলেন। মেজ বউ উল বের করে সোয়েটার বুনতে শুরু করলেন। নার্সকে বললেন, সময় হলে বলবেন, মুখে গঙ্গাজল দিয়ে দোবো।

ডাক্তার বৃন্দাবনের নাড়ীটা আর একবার দেখতে গেলেন, বৃন্দাবন ফিসফিস করে বললেন—ব্যস্ত হবেন না, আমি যাবার আগে একটু টাইম দিয়ে যাব।

বয়েসে

রোজ সকালে বিষ্ণুবাবু কি করেন? ঘুম থেকে ওঠেন। না, বিষ্ণুবাবু রাতে ঘুমোতে পারেন না অতএব ঘুম থেকে ওঠার কোন প্রশ্নই নেই। তবে হ্যাঁ, বিছানা ছাড়েন। বিছানা ছাড়েন সংসারের গুঁতোয়। তাঁর শোবার ঘরের বাইরের জগৎ হৈ-হৈ করে জেগে ওঠে। গোটাকতক নাতি-নাতনী। গোটা-দুয়েক পুত্রবধূ। গোটাতিনেক ডাকসাইটে ছেলে। একটি মুখরা ঠিকে-ঝি। সঙ্গে ততোধিক মুখরা তার মেয়ে অ্যাসিসটেণ্ট। সব মিলিয়ে এক বিচিত্র কনসার্ট। ঐক্যতান নয়, অনৈক্যতান।

বিষ্ণুবাবু বারকতক চা চা করে দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বাইরেটা দেখে নেন। দরজার বাইরে করিডর প্রশস্ত দুদিকে। একদিকে ছড়ানো জুতো, ঝ্যাঁটা, হাত মোচড়ানো আলুর পুতুল। অন্যদিকে খানকতক বই, খাতা পেনসিল আর একটি চেয়ারে বসে থাকা অসহায় একটি চরিত্র। এ বাড়ির গৃহশিক্ষক। বিষ্ণুবাবু শুধু চায়ের প্রত্যাশী গৃহশিক্ষক ভদ্রলোককে দেখলে দুঃখ হয়। তিনি ছাত্র-ছাত্রী দুটোরই প্রত্যাশা নিয়ে ঠায় বসে

থাকবেন। কোন কোন দিন ছুটোই পেয়ে যান। কোন কোন দিন একটা। কোন কোন দিন একটাও না।

চায়ের কি হোলো রে! দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে একবার হাঁক মেরেই বিষ্ণুবাবু ঘরে ঢুকে গেলেন। নিজের আধো-আলোকিত ঘর অনেক ভাল। বাইরেটা বড় বেশি পরিষ্কার, স্পষ্ট। 'হোওচ্ছে'। রান্নাঘর থেকে একটা কর্কশ কণ্ঠ উড়ে এল। বড় বৌয়ের গলা। বিষ্ণুবাবু তিনবার হাঁকবেন। এর মধ্যে চা এলো এলো, না এলো তো ভাঁজ-করা একটা বাজারের ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে পড়বেন। অবশ্য ক্যালেণ্ডারে একটা দাগ মেরে রাখবেন। হিসেবটা থাকা চাই মাসে কদিন চা পেলেন আর কদিন পেলেন না।

'কোই কি হোলো', গৃহশিক্ষকের তৃতীয় হাঁক। 'ওরে মেথী কোথায় গেলি, মাষ্টার বসে আছে।' ইস, সেই মাষ্টার! বিষ্ণুবাবু সিটকে গেলেন। কতদিন বলেছি মাষ্টার নয়, মাষ্টার নয়, মাষ্টারমশাই। বাড়ীর দুটো বৌই জানোয়ার। ছোটটার বৌ আনার সময় বেশ বাজিয়ে আনতে হবে। ও একদিনের দেখায় ঠিক চেনা যায় না। ছদ্মবেশে বাড়ির আনাচে কানাচে দিবারাত্র ঘুরতে হয় তবেই মা লক্ষ্মীদের আসল রূপ ধরা যায়। মাছের কানকো তুলে দেখার মত এক ঝলকের দেখায় জিনিস ঠিক বোঝা যায় না। ঠকে মরতে হয়। আজকাল আবার কানকোতে আলতা মাখানো থাকে।

'কি হোলো চায়ের।' জামার গলার বোতাম লাগাতে

লাগাতে বিষ্ণুবাবু দ্বিতীয়বার তাগাদা লাগালেন। এক কাপ চা করতে হাতে সব পক্ষাঘাত হয়। জটলা হচ্ছে মা লক্ষ্মীদের। সব কটার গলা শোনা যাচ্ছে কিন্তু চা হাতে এদিকে আসার গরজ কারুর নেই। মানুষ বৃদ্ধ না হইলে সুন্দর হয় না। একটু পালটে নি, মানুষ বৃদ্ধ না হইলে উপেক্ষিত হয় না। দরজা দিয়ে আর একবার গলাটা বাড়ালেন। একি! মাষ্টার মশায়ের পাশে একটা খালি কাপ রয়েছে মনে হচ্ছে! তার মানে! আমারটা ভুলেই মেরে দিয়েছে। বিষ্ণুবাবু গুটিগুটি শিক্ষক মশাইয়ের কাছে এগিয়ে এলেন। কি মশাই চা পেয়েছেন? করুণ মুখে ভদ্রলোক বললেন, 'আজ্ঞে না। চা, ছাত্রী কোনোটাই আসে নি।' বিষ্ণুবাবুকে খালি কাপের দিকে তাকাতে দেখে বললেন, 'ওটা বোধহয় কালকের। কাল সকালের কাপটা।'

'কেন আসেন আপনি? কি জন্য আসেন!' অসহায় ভদ্রলোককে বিষ্ণুবাবুর সোজা প্রশ্ন। কড়া প্রশ্ন।

'পড়াতে আসি।'

'কে পড়ে? দায়টা কার, আপনার, না যে পড়ে তার?'

'আজ্ঞে যুগটাই তো পালটে গেছে। পড়াশোনায় সব তেমন মন নেই। মায়েদেরও শাসন কমে গেছে।'

'বাপেরা কি করছে? বগল বাজিয়ে বংশ বৃদ্ধি করছে? কাল থেকে আর আসবেন না আপনি।'

'খাবো কি ? ছেলে ঠেঙিয়েই তো সংসার চলে। ভাত ভিক্ষে।'

'তবে মরুন। হাঁ করে বসে থাকুন।' বিষ্ণুবাবু গজগজ করতে করতে নিজের ঘরে এসে ঢুকলেন।

বেলা আটটার মধ্যে বাজার ফেলতে না পারলে ছেলেরা খেয়ে বেরোতে পারবে না। চায়ের জন্য বাজারের দেরি এ যুক্তি সংসার মানবে না। বিষ্ণুবাবুর পিণ্ডি চটকে 'দেবে। চাকরের ছেলে বলে কথা। সংসার মাথায় করে রেখেছে। তার আদর আগে না অবসর ভোগী বুড়ো বিষ্ণুর আদর আগে।

সেই বিষ্ণুবাবু চায়ের অপেক্ষা না করেই ব্যাগ হাতে বেরিয়ে পড়লেন বাজারের জন্যে। টাকাটা রাতের বেলাতেই বিষ্ণুবাবু নিয়ে রাখেন। চশমার খাপে ভরে রাখেন, হিসেবটা এখনো মা লক্ষীরা চায় না। তবে মাঝে মাঝে কানে আসে, একি বাজার। একটা মাত্র কপি। ওমা এই কটা আলু, সে কিরে ছোটো। দেখ বড়, মাছের টুকরোটা। তারপর থেকেই বিষ্ণুবাবু বাজারের থলেতে প্রতিটি জিনিসের 'কেজি প্রতি দাম' গ্রাম এবং দাম মন্তব্যসহ একটি চিরকুটে লিখে ভরে রাখেন। যেমন মাছ (কাটা পোনা) ১৮ টাকা কেজি দরে তুশো গ্রাম (আঁসসহ) ৩ টাকা ৬০ পয়সা। গতকল্য ষোলো টাকা ছিল। ফুলকপি প্রতিটি ৫৫ পয়সা হিসাবে তুটো ১ টাকা ১০ পয়সা। গতকল্য প্রতিটি ৫০ পয়সা ছিল। একবার ভেবেছিলেন বাজারের দায়িত্বটা ছেড়েই দেবেন। তারপর ভাবলেন, না,

শ্রমের বিনিময়েই পাত পাতবেন। বলতে যেন না পারে বুড়ো বসে বসে ভাত মারছে।

পাড়ার চায়ের দোকানের সামনে দিয়ে যাবার সময় একবার ভাবলেন, শীতের সকাল এক কাপ চা খেলে মন্দ হয় না? তারপরই মনে হল জীবনে যা কখনো করেননি তা এই বয়েসে কি করে করবেন। চ্যাংড়া ছেলে-ছোকরার সঙ্গে চায়ের দোকানে বসে চা খাবার বয়েস চলে গেছে। ধোঁয়া ওঠা কেটলির দিকে তাকাতে তাকাতে বিষ্ণুবাবু বাজারের পথে পা বাড়ালেন।

সাদা ধবধবে সোয়েটারের ওপর ঘি রঙের গরম চাদর। মাথার সব চুলই প্রায় ধবধবে সাদা। পায়ে চকচকে জুতো। সবাই ভাবেন বৃদ্ধের কি সুখ! তিন চাকরে ছেলে, ত বৌ। আহা কি সুখের সংসার।

বিষ্ণুবাবুর বাড়ি থেকে গৃহশিক্ষক বেরিয়ে এলেন শুকনো মুখে বিরক্ত নিয়ে। মনে তার গজগজানি, সামান্য কটা টাকার জন্য ভদ্রলোকের কি হেনস্তা। পান বিড়ির দোকানে টাবু সবে সিগারেট ধরিয়েছিল। তাড়াতাড়ি লুকিয়ে রেখে দোকানের মালিককে বলল, 'উরে বাপরে, কত বড় মানি লোক, ওঁর মত শিক্ষক এ তল্লাটে ছিল না। আমার বাবাকে উনি পড়িয়েছেন। এখন অবশ্য বয়েস হয়েছে। তাহলেও।'

তাঁরাই সুখী যাঁদের মন অর্ধ বিকল। মন যদি সবকিছু গ্রহণ করতে চায় তাহলে এ যুগে বেঁচে থাকার মত দুঃসহ যন্ত্রণার আর কিছু নেই। আমরা অভাবের সঙ্গে লড়াই করতে পারি, দারিদ্র্যের সঙ্গে সহবাসে অভ্যস্ত। বর্তমান কালের নৈতিক অবক্ষয় এক নতুন অভিজ্ঞতা।

সবকালের সবসমাজেই কিছু না কিছু দুর্নীতি ছিল। ঘুষখোর সরকারী কর্মচারী ছিল। চরিত্রহীন নারী-পুরুষ ছিল। অবাধ্য ছাত্র ছিল। ভোগী স্বার্থপর মানুষ ছিল। তারা থাকত যে যার এলাকায়। ছোট ছোট পচা মশা ভ্যানভ্যানে ডোবার মত। দুর্নীতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয় এখন দুর্নীতির সমুদ্র, উত্তাল, সুনীতির তট প্লাবিত করে, আদর্শ-টাদর্শ সব ভাসিয়ে নিয়ে চলে গেছে।

সুনীতি দুর্নীতির চেয়ে আরও আতঙ্কের হয়ে উঠেছে যে জিনিস, তা হল মূল্যবোধহীন মানুষ। বস্তুর গুণ নষ্ট হয়ে গেছে। আমাদের সম্পর্কের বাঁধন খুলে পড়ে গেছে। আদর্শ-

পরায়ণতা এখন উপহাসের বস্তু। যিনি কর্তব্য করতে চান তিনি মূর্খ। এক ধরনের বুদ্ধিমান মানুষ নতুন মূল্যবোধের হৃদয়হীন এক সমাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছে। ধূর্ততার ইট আর স্বার্থপরতার পলেস্তরা দিয়ে সেখানে নতুন ইমারত তৈরি হবে। গড়ে উঠবে প্রয়োজনের সংসার।

পুরুষের প্রয়োজন হবে নারীকে, নারীর প্রয়োজন হবে পুরুষকে। বিবাহ নয়, হবে চুক্তি। জৈব সম্পর্কের আলগা বাঁধনে সন্তান-সন্ততি আসবে যাদের বলা হবে মানুষের বাচ্চা। বেড়ালের কাছে থেকে শিখতে হবে সন্তান পালনের নীতি। বেড়াল জননীর সঙ্গে তার সন্তানের সম্পর্ক তদ্দিনই যদ্দিন না তার চোখ ফুটছে। চোখ ফুটে একটু চলে-ফিরে বেড়াতে শিখলেই মায়েরা অন্যরূপ। বাচ্চা সোহাগ করে কাছে এলেই ফ্যাঁস করে থাবা। তফাৎ যাও। নিজের ব্যবস্থা নিজে করে নাও। কিছুদিন পরেই দেখা যাবে বাচ্চা মাকে দেখলে ফ্যাঁস করে তেড়ে যাচ্ছে। কেউ আর কাউকে চেনে না। সম্পর্কিত শত্রু।

সিংহের কাছ থেকে মানুষ শিখবে। সিংহজননী তার শাবকদের নিয়ে পাহাড় বা উঁচু কোনও জায়গায় উঠে যায়। তারপর একের পর এক বাচ্চাদের ঠেলে ঠেলে ফেলে দেয় খাদে। যে শাবকটি খাদ বেয়ে উঠে আসতে পারে সিংহজননী তাকেই মানুষ করে।

মানুষ ছাড়া জীবজগতের শিক্ষাই হল, স্নেহ মমতা দয়া করুণা ভালবাসার কোনও দাম নেই। শক্তিতে বাঁচো, স্বার্থে

বাঁচো, লড়াই করে বাঁচো। পৃথিবীতে আসা মৃত্যুর জন্যে। ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখালেন :

লেলিহ্যসে ত্বং গ্রসিতুং সমন্তা-
ল্লোকান সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো ॥

লক্ লক্ করে জ্বলছে সর্বশরীর, মুখগহ্বর, গ্রাসিতে সকল দিকে সকল ভুবন। প্রচণ্ড তোমার তেজ অতি-দুর্নিবার, সর্বব্যাপী হ'য়ে বিষ্ণো! দহিছে সংসার।

ভগবান বলছেন : কালোহস্মি লোকক্ষয়কৃত প্রবৃদ্ধো
লোকান সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।

অর্জুন, আমিই প্রচণ্ড কাল লোকক্ষয়কারী, লোকনাশ হেতু আমি এসেছি ধরায়। মানুষ এতকাল এই সত্যটিকে ভুলে থাকার চেষ্টা করেছে। অর্জুনের মত কাতর কণ্ঠে বলেছে : নমোস্তুতে দেববর প্রসীদ। তোমার রূপ সংবরণ কর, শান্ত হও।

ভীত মানুষ, সংসারে আশ্রয় খুঁজেছে, পিতা-মাতার নির্ভরতা খুঁজেছে, নারীতে ভালবাসা খুঁজেছে, প্রকৃতিতে বিশ্বজননী খুঁজেছে। ঝুড়ি ঝুড়ি কাব্য সৃষ্টি হয়েছে, বিরহের গানে বাতাস কেঁপেছে, সাহিত্যে সম্পর্কের জয়গান হয়েছে, আদর্শের স্তম্ভ তৈরি হয়েছে। ঈশ্বরের কল্পনা করে মানুষ স্তব-স্তুতি করেছে! উপনিষদের ঋষি সূর্যের দিকে তাকিয়ে বলেছেন :

হিরন্ময়েন পাত্রেন সত্যাস্যাপিহিতং মুখং।
তৎ ত্বং পূষণ অগাবৃনু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে।

যে সত্য প্রকৃতই সত্য তা আমরা ভুলে থাকতে চাই। যে সত্য হল প্রতি মুহূর্তে আমাদের ক্ষয়, বিনাশ, একের হাতে অন্যের সংহার, মৃত্যু। ঋষিরা বলেছেন, হে জ্যোতির্ময়, তোমার জ্যোতির্বলয় সংবৃত কর। তেজোপ্রভা সংবৃত না হলে তোমার সত্যরূপ দর্শন করার সাধ্য আমাদের হবে না।

ঋষিপন্থা ছিল নিজের আধারকে বিশাল করে মানুষের ক্ষুদ্রতা, পঙ্কিলতাকে ধারণ করার মত একটা অবস্থা সৃষ্টি করা। নিৎসের যরথুস্ত্র বললেন ঃ

Verily, a polluted stream is man. One must be a sea to be able to receive a polluted stream without becoming unclear.

বিসর্জন নাটকে রঘুপতি জয়সিংহকে বলছেন ঃ

মূর্খ, তোমার আমার হাতে সত্য নাই
সত্যের প্রতিমা সত্য নহে, কথা সত্য
নহে, লিপি সত্য নহে, মূর্তি সত্য নহে—
চিন্তা সত্য নহে। সত্য কোথা আছে কেহ
নাহি জানে তারে, কেহ নাহি পায় তারে।

দুর্বলের সত্য এক রকম, সবলের সত্য আর এক রকম। সবল বলবে, বিবেক আবার কি বস্তু! বিবেকের দংশনই বা কি। The bite of conscience, like the bite of a

dog into a stone, is a stupidity সকলের বিবেক থাকে না, বিবেক হল দুর্বলের।

ইংরেজীতে একটি প্রবাদ আছে: Happy is the Country which has no history. সেই দেশই সুখের যে দেশের কোনও ইতিহাস নেই। হেগেলের কথায়: a State has no aim, we alone give it this name or that. সবল দেশ দুর্বল দেশের ওপর আধিপত্য বিস্তার করবে। বিজ্ঞানের যত উন্নতি সব চলে যাবে সবলের হাতে। বিজ্ঞান মানুষকে যত না বাঁচাবে তার চেয়ে মারবে বেশি! ইতিহাসে এই হল রাষ্ট্রের স্বরূপ। সহ অবস্থান, বিশ্বশান্তি সবই হল আমাদের কল্পনা, আরোপিত লক্ষ্য। প্রতি বছরে প্রতিরক্ষা খাতে আমেরিকায় ব্যয়বরাদ্দ বাড়ছে। দশ বছর আগে ছিল পঞ্চাশ বিলিয়ন ডলার। এখন আরও বেড়েছে। ভান্‌স প্যাকার্ড বলছেন: Any cutbacks would throw some constituents out of jobs and hit some of their local industries বিগ পাওয়ারসদের মধ্যে যেই শান্তির আদিখ্যেতা শুরু হয় অমনি আমেরিকার স্টক এক্সচেঞ্জ টলমল করে ওঠে। অর্থনীতিকে চাঙ্গা রাখতে কোথাও কোথাও একটা যুদ্ধ চাই।

ইতিহাসের লক্ষ্য কি আমাদের জানা নেই। ইতিহাসের শিক্ষা আমাদের জানা আছে।

যে কোন দেশের সমাজে একদল মানুষ কালে সভ্য হতে

হতে দুর্বল হয়ে পড়ে। নখের ধার কমে যায়, দাঁতের জোর কমে যায়, মন উদার হয়, তখনই বেজে ওঠে মৃত্যুর ঘণ্টা। দেশের সেই অংশ, যে অংশ সভ্যতার ধার ধারে না, যাদের আমরা নিউ জেনারেশান বলি, তারা তেড়ে আসে। অসভ্যতায় কখনও ভ্যাকুয়াম থাকতে পারে না। মেকি সংস্কৃতি, মূল্যবোধ সব চুরমার হয়ে যায়। সভ্যতা হয়ে দাঁড়ায় উপহাসের সামগ্রী।

তবু এত যুগ ধরে সভ্যতা বেঁচে আছে কি করে?

এই ব্যাপারে নিৎসের ব্যাখ্যা ভারি সুন্দর। দুর্বল, অসুস্থ মানুষ সবলের চাপে একক হয়ে পড়ে? মনে বনে কোণে শুরু হয়ে যায় তার একক সাধনা। সে হয়ে যায় শান্ত স্থিতধী, জ্ঞানী। যেমন যার দুটো চোখ, তার চেয়ে যার একটা চোখ সে ভাল দেখে, কারণ তার একটা চোখে দুটো চোখের দৃষ্টি এসে জমে। অন্ধের আবার অন্তর্দৃষ্টি খুলে যায়, শ্রবণশক্তি সাধারণ মানুষের চেয়ে প্রখর হয়। It is precisely the weaker nature who being more delicate and freer makes progress possible.

যে কথা দিয়ে শুরু করেছিলুম, আংশিক মানসিক পক্ষাঘাত ছাড়া এ যুগে বেঁচে থাকা অসম্ভব। সরে থাকা যাবে না, মরে থাকতে হবে। মাকিয়াভেলির কথা কত সত্য ছিল, the form of government is of very little importance, although the half educated think otherwise.

মাসী

নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলুম। জেতার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। ফলাফল যখন বেরলো, শুধু আমি নয়, আমার হয়ে যারা খাটাখাটি করেছিল তারাও অবাক। তাদের অবশ্য বিশেষ কিছুই করতে হয়নি। দেয়ালে হাজারখানেক পোস্টার সেঁটেছিল, আর দিনসাতেক একটা সাইকেল-রিকসা ভাড়া করে, ভাঙা মাইক নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছিল, জিতেন চক্রবর্তীকে ভোট দিন। মাইকটার আবার নিজস্ব কিছু বক্তব্য ছিল। সব সময়েই একটা সি সি আওয়াজ করত, মাঝে মাঝে আবার ধমক ধামকও দিত। কাকে ভোট দিতে বলছে, তিনি কোন দলের, সে দল জনসাধারণের জন্য কি করেছে বা করতে চায়, কিছুই বোঝা যেত না। আর সেই কারণেই আমাকে দুর্বোধ্য কবিতা ভেবে সকলে ভোট দিয়ে এলেন। সবাই ভাবলেন, জেনে ঠকার চেয়ে না জেনে ঠকা অনেক ভালো। তাছাড়া জনপ্রতিনিধি হল মেয়েমানুষের মত। মানুষ সবসময় নতুন নতুন জিনিস চায়। ঘরেরটিকে ছেড়ে পরের পেছনে দৌড়োয়।

যাক আমি এখন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, এম, এল, এ। আমার সাপোর্টাররা দুশো চকোলেট বোমা এনে দড়াদ্দম ফাটাতে শুরু করে দিল! পাড়ায় অন্য দুই হার্টের রুগী, আর ক্যানসারের রুগী আছেন। এখন তখন অবস্থা। সাপোর্টারদের ডেকে বললুম, এ তোমরা কি করছ ভাই, পাঁচজনের অসুবিধা করে এ তোমাদের কি আনন্দ।

হেড সাপোর্টার বললে, আপনি চুপ থাকুন জিতুদা। একটাও কথা বলবেন না। মনে করুন, আপনার মৃত্যু হয়েছে। আপনি এখন আমাদের সম্পত্তি। লোকের সুবিধে করার জন্যে কেউ এম. এল. এ. কি মন্ত্রী হয়! ছিলেন স্কুল মাস্টার কিছুই জানেন না। অনেক কিছু জানার আর শেখার আছে। বসুন চুপ করে। ইটখোলার মালিক নগেনের লরিটা এসে গেলেই, আপনার গলায় ফুলের মালা ঝুলিয়ে, কপালে চন্দন লেপে আমরা বিজয় মিছিল বের করবো। আজ রাতেই গোটা দুয়েককে মায়ের ভোগে পাঠাবো।

মায়ের ভোগে মানে?

আপনার মত সেকেলে লোক নিয়ে আমাদের মহাজ্বালা। কিছুই জানেন না, এম. এল. এ. হয়ে বসলেন। মায়ের ভোগ মানে, কেটে কুচিকুচি করে জলে ভাসিয়ে দেওয়া।

মার্ডার?

আমরা আর মার্ডার বলি না। বলি লাশ ফেলে দেওয়া।

সে কি লাশ? লাশ ফেলে দেবে কেন?

লাশ ফেলায় আমরা ভীষণ পেছিয়ে আছি। নির্বাচনের আগে একটাকে চেষ্টা করা হয়েছিল, সে ব্যাটার অখণ্ড পরমায়ু। বেঁচে উঠে, আমাদের রেকর্ড নষ্ট করে দিলে। অফসাইডের গোলের মত, হয়েও হল না। জেনে রাখুন জিতুদা, লাশের হিসেবেই পার্টির পোজিশান আর স্ট্রেংথ। রাজনীতিতে দাদা বোষ্টমের স্থান নেই। কাপালিক হতে হবে, নাগাসন্ন্যাসী হতে হবে। নৃমুণ্ডমালিনী হতে হবে।

বেশ বুঝলাম, আমি আমার হাতের বাইরে চলে গেছি। যেভাবে নাচাবে সেই ভাবে নাচতে হবে।

এ পাড়ার সবচেয়ে কুখ্যাত চোর বিধুশেখর দেখা করতে এলেন। হাতে ফুলের তোড়া, মিষ্টির বাক্স। মাল খেয়ে চোখের কোল দুটো ব্যাঙের মত হয়ে গেছে। লোকটাকে দেখেই আমার হাড় পিত্তি জ্বলে উঠল। বিধু আমার মনের ভাব বুঝতে পেরেছেন। অমায়িক হেসে বললেন,

দাদা, লাইনে নতুন এসেছো, তাই একটু কষ্ট হচ্ছে। বেশ্যার প্রথম রাতের মত। কাপড় খুলতে লজ্জা করে। জোর করে খুলে দিতে হয়। তারপর বলতেও হয় না! নিজেই খুলে দেয়।

লোকটার কথা শুনে মাথায় আগুন জ্বলে গেল। ব্যাটা বলে কি? আঙুল তুলে বললুম, গেট আউট।

লোকটা নড়ল না। বসেই রইল, ফোলা ফোলা মুখে ভাগাড়ের হাসি। আমাদের লম্ফঝম্ফ শেষ হতেই বললে,

প্রথম রাতে ওরাও ওই রকমই করে। করলেও কি নিস্তার পায়রে দাদা। মাসী আছে না। ভেটারেন মাসীরা জানে কি করে কাপড় খোলাতে হয়। কি করে পরপুরুষের সঙ্গে শোয়াতে হয়। প্রথম রাতের খদ্দেরদের একটু বেশি চার্জ দিতে হয়। বাধা একটা বাড়তি আনন্দর দাদা। আমি তাই তৈরি হয়ে এসেছি। মিষ্টির বাক্সের তলায় একটা খাম আছে। ওটা তোমার নয়, তোমার গৃহিণীর। শুনলুম গয়নাটয়না বেচেছিলে। দেখেছ, সব খবর রাখি। আমরা হলুম এই জমানার নাক, মুখ, চোখ, কান। পারো তো, একে একে উদ্ধার করে দিও।

খুব রেগে গিয়ে বললুম, দেশের সেবা করবার জন্যে আমি, আমার পরিবার, সবাই বিবস্ত্র হতে রাজি আছি। জানেন আমার পিতামহ স্বদেশী করতেন।

বিধু ভিলেনের মত হেসে বললেন, বালক! খোকা? খোকাবাবু, তোমার দেশ কোথায়, যে সেবা করবে?

কেন? যাঁরা আমায় ভোট দিয়েছেন, তাঁরাই আমার দেশ, তাঁদেরই আমি সেবা করব। জীবন দিয়ে।

আহা, আমার মানিক রে! বিদ্যাসাগরের প্রথমভাগের ভাষায় কথা বলছে রে। আজকাল আর একা দেশ সেবা করা যায় না চাঁদু। সেই স্বদেশীযুগ আর নেই। সেবা করে পার্টি। পার্টির দেশ অনেক ছোট। সাপোর্টাররাই হল দেশ। তোমার চামচারাই হল দেশ। তোমার স্ত্রী পুত্রই হল দেশ।

তুমি নিজে হলে একটি দেশ। বেড়ালের ভাগ্যে শিকে একবার ছিঁড়েছে। এইবার বুদ্ধিমানের মত চামচে কালচার করো, নিজের একটা কিংডাম তৈরি করো। খোকামি করে আখের নষ্ট কোরো না। জেনে রাখো তুমি হলে আমাদের শিখণ্ডী।

বিধুশেখর চলে গেলেন।

সত্যি কথা বলতে কি, আমার আনন্দ-টানন্দ সব চলে গেল। বাইরে নগেনের ইটখোলার লরি থামার শব্দ হল। তাসা বাজছে চড়াক চড়াক বোলে। মালা এসেছে। আবীর এসেছে। এক হোটেলঅলা পেটি পেটি কোল্ড ড্রিঙ্কস পাঠিয়েছে। ব্যাটা একটা বার লাইসেন্স চায়। একটু পরেই ওরা আমাকে নিয়ে বিজয় মিছিলে বেরোবে। তবু আমি নিরানন্দ। মনে হচ্ছে সত্যিই আমি এক সেই, বসে আছি সেজেগুজে একা ঘরে। মাসী গেছে প্রথম রাতের খদ্দের ধরতে দরজায় শিকল তুলে।

গরলপুত্র

কোন কালেই বেঁচে থাকাটা এখনকার কালের মত এমন লাঠালাঠির ব্যাপার ছিল না। সব সময়েই যেন যুদ্ধ করে বেঁচে থাকা। জীবন যুদ্ধ!

সেকালের মানুষ সকালে উঠে কি করতেন? এক গেলাস চিরতার জল খেয়ে ভোরবেলা মুক্ত বাতাসে বেড়াতে যেতেন। বেড়াতে যাবার প্রয়োজন হত। তখনকার মানুষের শরীরে মন বলে একটা বস্তু ছিল। পাখির ডাকে, ভোরের বাতাসে, সে মনে পুলক লাগত। আকাশ পৃথিবী, জল ফল, ফুল দেখার অবকাশ ছিল। প্রাণ ছিল, এখন তো সব প্রাণহীন প্রাণ। ঘড়ির মত টিক টিক করছে। চলে কিন্তু ভাবে না।

তখনকার মানুষের ভোগ ছিল, এখন দুর্ভোগ। রাতে গাওয়া ঘিয়ে ভাজা ফুলকো লুচি। বেগুন ভাজা, মুচমুচে আলুভাজা। মাছের কালিয়া অথবা ডিমের কারি। একবাটি ক্ষীর। তখন চিংড়ির মালাইকারি খুব হত বাড়িতে বাড়িতে। পাড়া ম ম করত মাংস রান্নার ফ্লেভারে। ভোরে না বেড়ালে

হজম হবে কি করে! দীর্ঘদিন বাঁচতে হবে। কত ভোগ এখনও বাকি! তিন তীর্থ শেষ হয়েছে, সাত তীর্থ বাকি। বাতে ধরলেই বিপদ। বাবু তাই ভোরে চিরতার জল খেয়ে নেচে নেচে বেড়াচ্ছেন। ফেরার পথে পছন্দসই একটি রুই কি ইলিশ হাতে ঝুলিয়ে বাড়ি ফিরছেন। গৃহিণী দেউড়িতে দাঁড়িয়ে কর্তাকে অভিবাদন জানাচ্ছেন।

ওমা, কি সুন্দর মাছ এনেছ গো? আহা রূপোর বরণ কান্তি।

পূবে সূর্য উঠছে লাল হয়ে, এদিকে এয়োস্ত্রীর সিঁথিতে টকটকে সিঁদুর। পুত্রবধূদের উল্লাস, কলরব। পরিপূর্ণ সংসারের ছপ্পর ফুঁড়ে সুখ উথলে পড়ছে।

গিন্নি ভাবছেন, বাবা বলেছিলেন, দেখেশুনে তোকে ভাল হাতেই দিয়ে গেলুম মা। এখন তোর বরাত।

তখন মানুষ ক্রমশই বড় হত। এখন উল্টোটাই হয়। ছোট হতে হতে জীবন ক্রমশই উঞ্ছবৃত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। তখন নীতি বাক্য ছিল, ওহে সংসারী মানুষ, আয় বুঝে ব্যয় কর। কাট ইওর কোট অ্যাকর্ডিং টু ইওর ক্লথ। সেই বাক্যে আজ কর্ণপাত করলে, কোট আর কাটা হবে না, বড়জোর লাল একটা ল্যাঙোট হতে পারে।

মাঝে মাঝে ভাবি, যাদের ভাল, তাদের সব ভাল, ইউরোপ, আমেরিকা ধনীদের দেশ। ইচ্ছে করলেই মেয়েরা সেখানে বারো হাত, চোদ্দ হাত শাড়ি পরে ফড়ফড়িয়ে ঘুরতে পারে।

কিন্তু পারে না, তিন ছটাক কাপড়ের বিকিনি পরে জীবন কাটিয়ে দিতে। ওই পোশাকে যৌবনটিও কেমন খোলতাই হয়। মনে মনে বসন্তের জোয়ার বইতে থাকে। এদেশের পুরুষমানুষের মত ওদেশের পুরুষকে অমন ছোঁক ছোঁক করে মরতে হয় না। সায়েবদের চোখের দৃষ্টি ওই জন্যে একেবারে সোজা। বীরের মত, সাধুদের মত চাহুনি। আমাদের দৃষ্টি ওই জন্যেই ত্যারছা, ছিঁচকে চোরের মত। মেয়েরা অমন দৃষ্টি একেবারে পছন্দ করে না, প্রায়ই বলতে শুনি, দেখ, ভাই দেখ, লোকটা কি রকম শকুনির মত তাকাচ্ছে দেখ।

মানুষ যা চায়, তা না পেলে ছোঁচা হয়ে যায়। বেড়ালের মত চুরি করে হাঁড়ি খেতে ছোটে। সারা মুখে চুন কালি মেখে ফিরে আসে। সব ব্যাপারটাই আমাদের হাঁড়িখেকো বেড়ালের মত। শখ আছে সঙ্গতি নেই। ধনপতি সদাগর আকাশে উড়ছেন তো আমাদেরও উড়তে হবে। লাট খেয়ে পড়লেন হাজার টাকা মাইনের ছা-পোষা কেরানী। পাওনাদার এসে প্যাণ্ট খুলে নিয়ে গেল!

রোজ দশ টাকার বাজার করতে যার দাঁত ছরকুটে যায় তিনি পাশের বাড়ির কালোয়ারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কিস্তিতে কিনে ফেললেন ফ্রীজ। এইবার সেই ফ্রীজ ভরতে কাবলীওলার কাছে হাত পাত। ফ্রীজের সঙ্গে ফ্রীজের মালিকও ফ্রীজ হয়ে গেলেন। ডিম খাচ্ছেন, মাছ খাচ্ছেন, পুডিং খাচ্ছেন, আইসক্রীম খাচ্ছেন, লেমন স্কোয়াশ খাচ্ছেন, আর

চোখ ক্রমশই কপালে উঠছে। টেঁসে না গেলে দেউলে হতে হবে।

অতীতের মানুষ বাজেট রেখে চলতেন। কাল দশ টাকার মাছ খেয়েছি, এখন তিনদিন নিরামিষ। এ নিয়ে সংসারে কোন বিদ্রোহ হত না। এ যুগের গৃহিণী বলবেন, সে কি কথা! আমাদের লকুবাবু মাছ না হলে একগাল ভাতও মুখে তুলবেন না। ছেলের এমন লবাবি মুখ হয়েছে না! আমরা ছেলেদের নবাব বানিয়েছি, আদরের আতিশয্যে, অতিমানব ধারার অতি আগ্রহে, নিজেদের স্বভাবের বিরোধী করে তুলেছি। সংসারের স্বাভাবিক দুঃখ-সুখের বাইরে রেখে এমন একটা মানসিকতা তৈরি করে দিয়েছি, তারা আর পরিবারের একজন নয়, একজন মহামান্য অতিথির মত।

কারুর কিছু জুটুক না জুটুক, ছেলের সকালে চাই ডিমসেদ্ধ, একপো দুধ, রুটি মাখন, কলা, মাছ চাই, মাংস চাই তার ওপর বিজ্ঞাপনে দেখা স্ট্যামিনা বাড়াবার টনিক চাই।

সে যুগের ছেলেমেয়ে কিভাবে মানুষ হত! বিদ্যাসাগর কি হাফবয়েল খেয়ে অ্যাংলো স্কুলে পড়তে যেতেন? তিনি তো ছাত্রজীবন থেকেই ভাতে-ভাত রেঁধে খেতেন, পিতাকে খাওয়াতেন। দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে যা হয়েছিলেন তার ধারে কাছে আজও কেউ যেতে পারলেন না। রবীন্দ্রনাথের প্রশস্তি পড়লে তিনি কি ছিলেন এই আত্মবিস্মৃত জাতি জানতে পারবে।

বিবেকানন্দ কি বিকেলে কাজুবাদাম খেতেন? ঠ্যাং তুলে বসে থাকতেন মহামান্য অতিথির মত? পিতামাতা চারপাশে হুমড়ি খেয়ে পড়তেন কি? আহা, বাছা আমার বলে মাথায় তুলে নৃত্য করতেন? নেতাজীর শৈশব কি রকম ছিল? অগহর্ণ না পেলে থালা ছুড়ে বলতেন, ড্যাম ইট!

যাঁদের নাম ভাঙিয়ে বাঙালী এখনও চালাচ্ছে, তাঁরা কেউ ধনকুবের ছিলেন না। নিজেদের ব্যারণ কিংবা লর্ড ভাবতেন না। বড় হবার বীজ ভিটামিনে নেই, আছে চরিত্রে। আমাদের সবকিছুই এখন ক্যারিকেচারের মত।

নিজেরাই নিজেদের কবর খুঁড়ে চলেছি। সংসার করছি, সংসারকে নিয়ন্ত্রণে রাখার মত ব্যক্তিত্ব নেই। আগেকার দিনের কর্তারা একবার না বললে, কারুর বাবার ক্ষমতা ছিল না, হ্যাঁ করার। সামান্য একটু গলা খাঁকারিতে সমস্ত বাড়িটাকে স্তব্ধ করে দিতে পারতেন। কি হচ্ছে কি বললেই সব বাঁদরামি ঠাণ্ডা। এখন সংসার চালাবার ধারাটাই আমরা বদলে ফেলেছি। যিনি ভালমানুষ তিনি সাত চড়েও রা কাড়বেন না। ন্যায়েরও তাল দিচ্ছেন, অন্যায়েও তাল দিয়ে চলেছেন। সবাই মাথায় চড়ে নাচছেন। সংসারে তিনি প্রয়োজনের মানুষ। গরু যদ্দিন দুধ দেবে তদ্দিনেই তার খাতির। দুধ ফুরোলেই খোঁয়াড়ে দিয়ে আসবে। খোঁয়াড়ে হয়তো দেবে না। তবে বাড়ির পরিবেশটাকে এমন করে তুলবে মনে হবে যেন খোঁয়াড়।

সংসারে আর এক ধরনের গৃহী পাওয়া যাবে যাঁদের সমাজ-বিরোধী বললেও অন্যায় হবে না, সংসার করেছেন কিন্তু দায়িত্ব পালনে কাতর, স্ত্রী পুত্র পরিবারের খবর রাখেন না। এঁরা ঠিক উদাসী নন, জোর করে ধরে সন্ন্যাসীকে গৃহী করা হয়েছে, তা নয়। এঁরা সূক্ষ্ম বিচারে এক ধরনের অপরাধী। চরিত্রে বাঁধন নেই। রেস খেলছেন, মদ্যপান করছেন, অন্যান্য ব্যাপারেও বেশ সড়গড়। সংসারে অহরহ চুলো জ্বেলে রেখেছেন।

আসল কথা, মানুষ আর নেই। কিছু প্রাণী আছে, যারা লক্ষ্যভ্রষ্ট, আয়েসী। নাচালে নেচে ওঠে। কি করলে ভাল হতে পারে, সেই জ্ঞানটাই হারিয়ে গেছে। কোন বাড়িতেই আর শান্তি নেই। খেয়োখেয়ি, চুলোচুলি। সবাই স্বাধীন। প্রাণ যা চায় তাই করব। মানামানি আবার কি!

যাঁরা শান্তিপ্রিয় মানুষ, তাঁরা পথ বের করে ফেলেছেন। মুখ বুজে একপাশে পড়ে থাকি। যার যা প্রাণ চায় করে যাও। যদ্দিন পারব আবদার রাখার চেষ্টা করব।

এযুগে সবচেয়ে বেশি মার খাচ্ছেন এই মনোবৃত্তির মানুষ, স্রোত বইছে উল্টোদিকে, সরে থাকার উপায় নেই, ভেসে চল। এঁদের প্রায়ই চোখে পড়বে, বাসে ওঠার দাঙ্গায় এঁরা নেই, একপাশে দাঁড়িয়ে আছেন উদাস মুখে। ভাবছেন, এ তো মানুষের আচরণ নয়, ক্ষিপ্ত পশুর। শাসকরা তো মানুষ চান না, পশুই চান। পশুর ছবি তিনটি. আহার, নিদ্রা, মৈথুন।

র‍্যাশানে পচা চাল, খুপরিতে নিদ্রা, আর মৈথুন। কোন্ কালে মহিলা এত সহজপ্রাপ্য ছিল! ফ্রি সেক্সের নামে চতুর্দিকে পর্ণোগ্রাফির স্রোত বইছে। ছায়াছবি মানেই যৌনতা, খুন, জখম, রাহাজানি, বলাৎকার। এর বাইরে আর কিছু নেই।

মানুষকে প্রাথমিক স্তরে রাখতে পারলে রাজত্ব চালানো সহজ হয়ে যায়। 'মেটো' তো মানুষকে ফেলে রাখ। পোকার মত কিলবিল করুক, এক জায়গায় অনেক মানুষ মানে নিজেদের মধ্য খেয়োখেয়ি। অন্য ব্যাপারে মাথা ঘামাবার অবকাশ কোথায়! প্রতি মুহূর্তের বাঁচার সংগ্রামেই ক্লান্ত। ভাবনা-চিন্তার অবকাশ নেই। বিচার-বুদ্ধি লুপ্ত. আকৃতি মানুষের, চরিত্র পশুর—এই ধরনের জীবকে সহজে কিনে ফেলা যায়, খেপিয়ে তোলা যায়, যেমন খুশি ব্যবহার করা যায়।

গণতন্ত্রের প্রহসনে এরা এক নম্বর উপাদান।

নিষ্ঠুর আত্মকেন্দ্রিক, অনুদার, নীচ। সামান্য কিছু পেলেই এরা হাত তুলে জয়ধ্বনি দেবে, কখনও এক হতে পারবে না। এদের সব দাবিই হবে ব্যক্তিগত। আমাদের বলে তেড়ে আসতে পারবে না। কয়েকটাকে কিছু দিলেই, তারা নেতা হয়ে বাকিগুলোকে নাচাতে পারবে। মানুষটাকে মারতে পারলেই সমস্যা সহজ। কুকুর কখনো দাবি করবে না, আমার জন্যে স্বর্গ তৈরি করে দাও। তার দাবি এক টুকরো হাড়। মানুষের দেবশক্তি জেগে উঠলে ভয়ের কথা, সে আর তখন ভয় পাবে না। অথচ ভয়ই হল একমাত্র অস্ত্র।

অল্প কয়েকজনের জন্যে দানবীয় ব্যবস্থা রেখে বাকি সকলকে ঠেলে দাও নরকে। যমদূত তৈরি রাখো, সময় মত ড্যাভো: মারো। পেশাদার গুণ্ডাদের কুচকাওয়াজ চলুক। কোন কিছুই সহজপ্রাপ্য রেখো না। তেল নেই, চাল নেই, শিক্ষা নেই, বিদ্যুৎ নেই, পরিবহন নেই, জল নেই, স্বাস্থ্য নেই, বাসস্থান নেই। উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার মধ্যে থাকতে থাকতে বাঁচা: ইচ্ছেটাই চলে যাবে। ছেলেধরারা কলসীর মধ্যে বাচ্চাকে রেখে বিকলাঙ্গ তৈরি করে। রাজনীতির কারখানায় বিকলাঙ্গ তৈরি হচ্ছে। ন্যালা খ্যাবলা মানুষের দল, স্বভাবে শয়তান। কোন কালে বেঁচে থাকার অভিজ্ঞতা এমন ভয়ঙ্কর ছিল! প্রতি মুহূর্তে জীবনমরণ সমস্যা। সংস্কৃতির বড়াই। অন্য দেশের মানুষ গ্রহান্তরে চলে গেছে।